ঐকতান 2020 Oikotan

BENGALI CULTURAL SOCIETY · CLEVELAND · OHIO

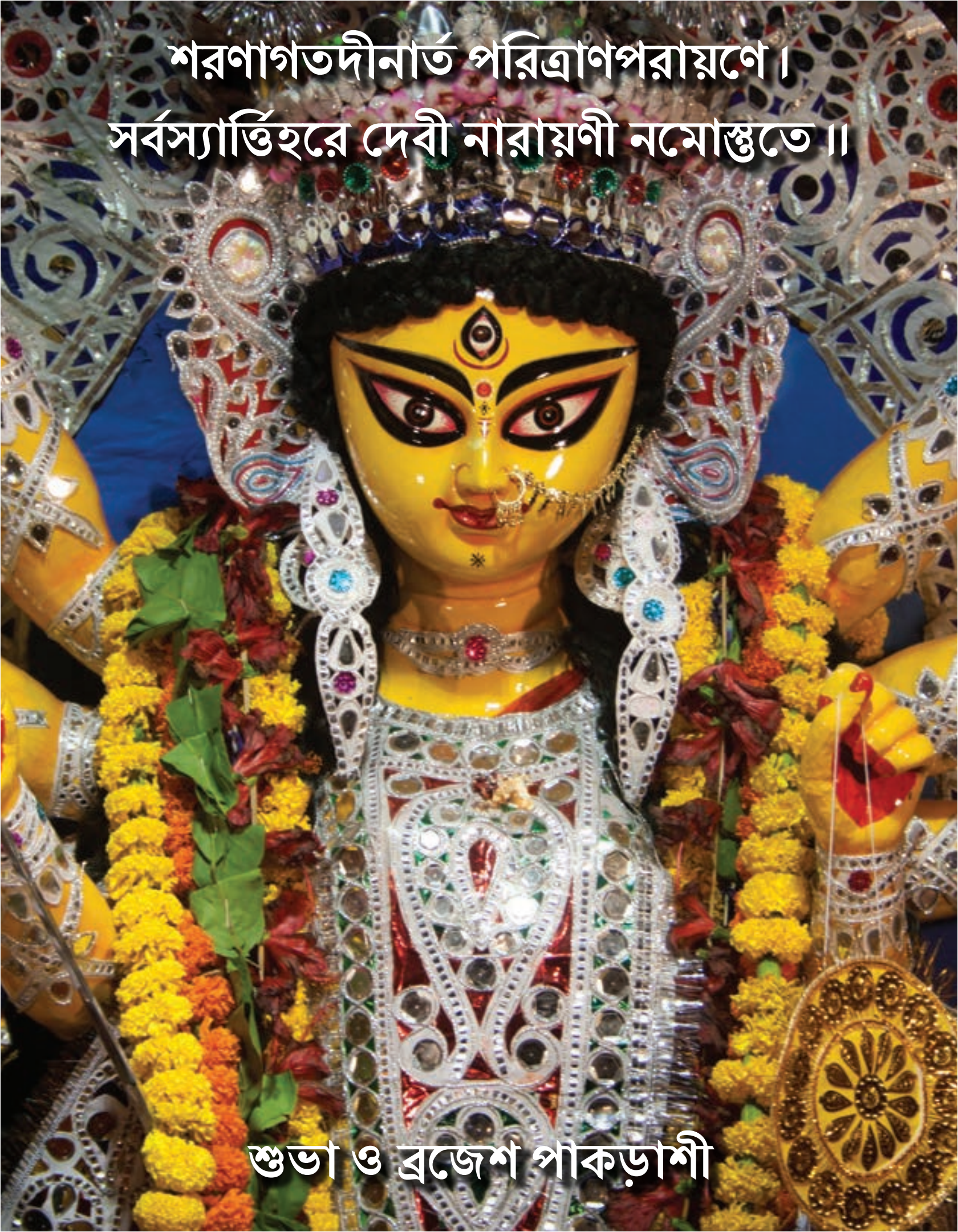
শরণাগতদীনার্ত পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্ত্তিহরে দেবী নারায়ণী নমোস্তুতে ।।
শুভা ও ব্রজেশ পাকড়াশী

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সুজিত, বৈশাখী, সুরঞ্জিত ও সঞ্জনা

Best Wishes and Puja Greetings

Rihan, Tithi and Tarun Podder

সূচীপত্র

Editorial vii
2020 Executive Committee ix
PUJA Schedule xi
BCS Agomoni 2020 xi
Tentative Schedule* xi
Treasurer Report 2019 xiii
Sub-Committees 2020 xv

গল্প ও বিশেষ রচনা

আবোল-তাবোলের দেশে • অত্রিয় ঘোষ 1
শ্যামা মা কি আমার কালো রে... • ব্রজেশ পাকড়াশী 3
এই শীত এই বর্ষা • তিতাস মাহমুদ 5
20/20 IN 2020 • Chandana Sarkar 7
বসুধৈব কুটুম্বকম • অনিল বিশ্বাস (কলকাতা) 9
ভালবাসার উত্তরাধিকার • দেবপ্রিয়া গোস্বামী 11
পরিচয় • পল্লব ভট্টাচার্য্য 15
দৈবের বশে, প্রবাসে • নবীন নাগ 17
Pandemic • Taniya Talukdar 21
Stopping Hitler and the Autumn of 1943 • Rajanya Bishi 27
Why is Durga Puja 35 days after Mahalaya in 2020? • Raja P Kumar 37
A Memorable Trip • Aniket Sen, Freshman, Aurora, OH 39
Guitly, Though Never Charged • Swapna Banerjee 41
Neorealism in Satyajit Ray's Movies • Mandira Chattopadhyay 45
Life Is A Rainbow • Rajonya Pramanik 47
আমার কথা কি তোমারও? • সুদেষ্ণা বিশী 49
WWW.অন্তরাল.নেই • সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো) 51
করোনাভাইরাস / টাচফোন (অনুনাটিকা) • রাজু দাস 55
মানবিক মূল্যবোধ • নমিতা দাস (কলকাতা) 59

কবিতা ও ছড়া

অন্য অজুহাতে • ড. আতিউর রহমান 65
উজ্জীবন • ব্রতী ভট্টাচার্য 65
On His Deep Memories • Jahar Haque 67
Silently • Sanchita Mal Sarkar 68
Lockdown পাঁচালী • দেবপ্রিয়া গোস্বামী 69
The Hardships of a Table • Sourya Bhattacharya (10 Years) 71
Very Berry • Anahita Chowdhury (8 Years) 73

অঙ্কন

Snehakshi Mondal (6 Years) 75
Ayona Sen (7 Years) 75
Rohan Ghosh (9 Years) 76
Riyana Sengupta (8 Years) 76
Nehali Dey (9 Years) 76
Anushka Goswami (9 Years) 77
Aaryav Mukherjee (8 Years) 77
Prachaya Upreti (9 Years) 78
Rishabh Deb (9 Years) 78
Aaditri Ghosh (9 Years) 79
Sonakshi Mondal (11 Years) 79
Aryan Ghosh (12 Years) 80
Aanavi Biswas (11 Years) 80
Sumeet Chakravari (13 Years) 81
Riddhima Deb (13 Years) 82
Aankhee Talukdar (15 Years) 83
Chumki Deb 84
Puja Ghosh 85
Seema Das 85
Debolina Maity 87
Sharbani Ghosh 87
অমিতাভ চৌধুরী 89
শুভজিৎ ব্যানার্জী 91

কমিক্স

গণেশের বাহন • শুভজিৎ ব্যানার্জী 92

প্রচ্ছদ চিত্র

সুস্মিতা দে

Editorial

As we wait for this
hell to end every day,
We can't do anything
but to hope and pray.

Written by Swastika Datta, these lines are relevant in today's time.

Durgatsav is here again, but this year things are somber. There is no excitement in the air, no hustle about the pujo preparations, women aren't enthusiastic about which saris to wear, men aren't looking forward to catching up with their community brothers for the 3-days of pujo and the children aren't going to be running around with their friends in complete abandonment.

BCS 2020 commenced the year on a great note. With a successful Saraswati Puja hosted at the Shiva Vishnu Temple, the Executive Committee, and most importantly, the community members were fully engaged and set a great tone for the events to come.

From the arrangements of the Pujo, to the food quality, to the cultural program for the kids, everything went smoothly. However, we're unfortunately unable to follow-up, but we're a resilient bunch!

With this challenge of social distancing, the 2020 EC got innovative and learned to keep up with the current times by moving all programs to the virtual world.

An online live adda session was organized by the cultural secretaries aptly titled, Aaj Ektu Golpo Hok. This program, which was first of its kind for BCS, saw participation from all quarters of the community including senior members.

Keeping up with the social responsibility spirit, there were multiple fundraising campaigns executed successfully. While we initially started a campaign for Covid-19 here in Cleveland, it had to be expanded to raise funds for Amphan, the cyclone that caused widespread damage in West Bengal, to help our brothers and sisters in need back home. We were fortunate to raise significantly more funds than our original goal, which shows the undeterred support of our community members!

The virtual summer program was next in line; it was a celebration of life itself. In lieu of the Baishakhi Sandhya this year, we hosted Jibon, Joy O Prarthana - that saw performances by local artists.

Being a broadcasted event, this gave the opportunity to the performers to get more creative and the result was some greatly shot videos. It really highlighted the production qualities and capacities of some of our members.

Renal Consultants Inc. of Canton

Wishes everyone a

Happy Durga and Laxmi Puja

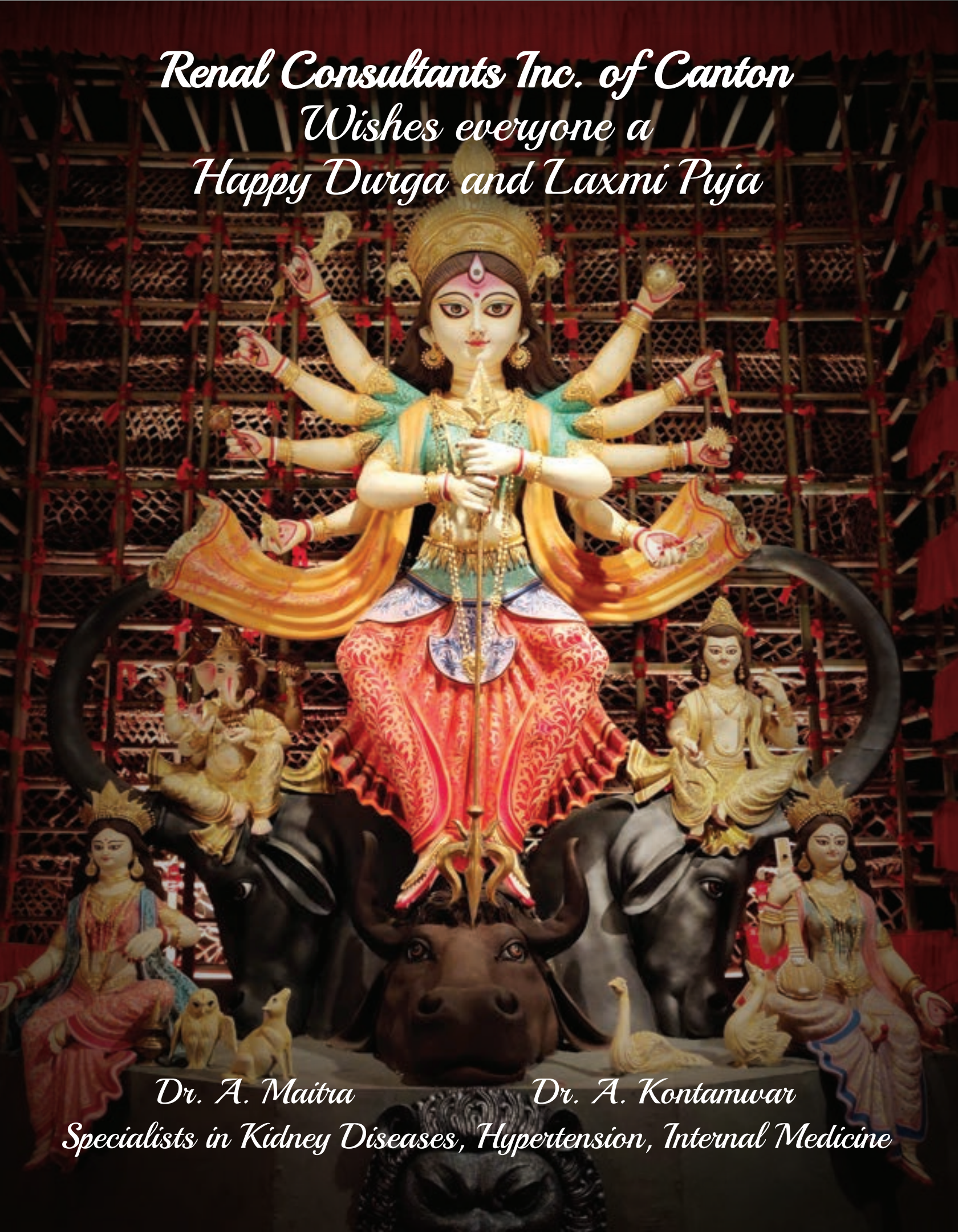

Dr. A. Maitra Dr. A. Kontamwar

Specialists in Kidney Diseases, Hypertension, Internal Medicine

2020 Executive Committee

President – Rajlakshmi Ghosh

Vice Presidents - Taniya Talukdar, Partha Sen

Secretaries - Shaubhik Goswami, Sandeepan Dutta

Treasurers – Amit Ghosh, Rajib Pramanik

Cultural Secretaries - Ambalika Das Gupta, Soumyajit Paul

Youth Coordinators - Aankhee Talukdar, Debjoyee Sadhukhan,
Wriddhi Nandan

Trustees - Soumitra Ghosh, Jahrul Haque
Bhaswati Bandyopadhyay

BIJOYA GREETINGS...

DHARMINDER L. KAMPANI

ATTORNEY-AT-LAW

Key Bank Building
17140 Lorain Avenue
Cleveland, Ohio 44111
Office: (216) 251-8023

PUJA Schedule

BCS Agomoni 2020

Tentative Schedule*

Friday Oct 23
8:00 PM - Kid's Agomoni (Children's Cultural Program)

Saturday Oct 24
11:00 AM – Live telecast of Durga Puja at Shiva Vishnu Temple, Parma, OH
3:00-5:00 PM – Dinner pickup
8:30 PM – Virtual live concert by SaReGaMaPa famed artists Sourav Das and Swarnali Bose

Sunday Oct 25
1:00 PM – Pujor Saaj (photo contest)
2:00 PM – Online General Body Meeting
4:00 PM – Natok "Bharaate Chai" directed by Pallab Bhattacharya

Saturday Nov 7
Lakshmi Puja – Live telecast of Durga Puja at Shiva Vishnu Temple, Parma, OH, Time TBD.

Sunday Nov 8
11:30 AM – Virtual live concert by singer Sohini Bhattacharya

*Kindly note that that due to the pandemic, schedule may change.

শারদোৎসবের শুভেচ্ছাসহ...

তৃণা, এ্যালিসা, প্রান্তিক, সমীরা

গোপাল ও শিপ্রা সাহা

Sub-Committees 2020

Priests
Brojesh Pakrashi (Convener)
Smarajit Bandyopadhyay
Kaushik Ghoshal

Puja Preparation
Anuradha Bhadra
Shyamasree Datta
Ambalika Das Gupta
Amrita Kobi
Mahua Das Sharma

Technical Help
Sandeepan Dutta
Soumyajit Paul
Soumen Bhattacharya
Shaubhik Goswami

Saraswati Puja 2020

Protima Transportation
Ananya Biswas
Rupak Deb
Arunabha Kundu
Jayatu Das Sarma
Jaydip Das Gupta
Bikram Roy

Dadhi Karma
Shyamasree Datta
Subhashri Ghosh
Swapna Banerjee
Rajlakshmi Ghosh

Overall Logistics
Jaydip Das Gupta
Soumyajit Paul
Partha Sen
Shaubhik Goswami
Utpal Dutta
Bikram Roy

Mandap Decoration
Rupak Deb
Seema Das
Ananya Biswas
Rabisankar Talukdar
Aankhee Talukdar
Arunabha Kundu
Debjani Kundu
Soumyajit Paul
Punam Pramanik

Kids Program Help
Rani Sen
Chumki Deb
Debopriya Goswami
Mahua Das Sharma

Kids Sit n Draw
Shaubhik Goswami
Bikram Roy

Puja Prasad
Sujata Mitra
Sudeshna Mitra
Sanchita Mal Sarkar
Rani Sen
Puja Ghosh
Debopriya Goswami
Debjani Kundu
Punam Pramanik
Korobi Dey
Sugata Chatterjee

Khichuri Team
Jaharul Haque (Convener)
Utpal Datta (Convener)
Ranjan Dutta
Ramen Majumdar
Paritosh Chatterjee
Niloy Bhadra
Prabar Ghosh
Jaydip Das Gupta
Ananya Biswas

Fundraising and Advertisement
Taniya Talukdar
Rajib Pramanik
Amiya Ghosh
Ambalika Das Gupta

Social Media & Communications
Taniya Talukdar
Kingshuk Das
Soumen Bhattacharya
Soumyajit Paul

Puja Magazine
Soumen Bhattacharya (Convener)
Susmita Dey (Cover Art Design)
Debolina Maity (Logo)
Amrita Nandi
Taniya Talukdar
Sandeepan Dutta
Soumyajit Paul

Cultural Program
Ambalika Das Gupta
Soumyajit Paul
Pallab Bhattacharya
Seema Das

Youth Coordinators
Wriddhi Nandan
Debjoyee Sadhukhan
Aankhee Talukdar

আবোল-তাবোলের দেশে

অত্রিয় ঘোষ

"রাম গরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা।" আর হাসবোই বা কি করে, এই বছরটা যা কাটলো! মহামারি, ঝড়-বৃষ্টি, আগুন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কোনটাই আর বাকি নেই। ছোটবেলায় "আবোল-তাবোল" বইতে পড়েছিলাম বোম্বাগড়ের কথা। কি অদ্ভুত সে দেশ, অদ্ভুত সব কাণ্ড হয় সেখানে। কিন্তু আজ খবরটা পাওয়ার পর থেকেই আমেরিকার উত্তর পূর্ব কোণার এই ছোট্ট ক্লিভল্যান্ড শহরটাকেই বোম্বাগড় বলে মনে হচ্ছে। তা না হলে বাঙালিদের দুর্গা পুজো কোন দিন ভার্চুয়াল হয়! এর থেকে বেশি অদ্ভুত কাণ্ড আর কিছু হতে পারে কি?

সত্যি, আজকাল আমার প্রায়ই মনে হয় আমরা এক কিম্ভূত দুনিয়াতে বাস করছি, অনেকটা "বকচ্ছপ"- এর মত। আবোল-তাবোলের কল্পনা এসে এইবার স্বাভাবিকের " মুণ্ডু চেপে" বসেছে। বিচিত্র সব ঘটনা ঘটছে। কুমড়ো পটাশ ভাইরাসের রূপ ধরে হঠাৎ এসে হাজির। তার ভয়ে কেউ টয়লেট-পেপারের জন্য মারামারি করছে, আবার কেউ এপ্রিল মাসে পটকা ফাটাচ্ছে। থালা-বাসনদের হয়েছে ভারি মুশকিল, বেচারারা একদম "স্পিক টি নট্", মার খাচ্ছে পটা-পট্। দেশে দেশে একুশে আইন জারি, হাঁচতে-কাশতে টিকিট লাগছে। পুলিশ "হাঁচলে পরে বিন্ টিকিটে, দন্দমাদম্ লাগায় পিঠে"।
এরই মধ্যে, এক সম্ভাব্য গোঁফ চুরির দায়ে, ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অরগানাইজেশনকে জরিমানা করেছেন হেড অফিসের বড়বাবু। তাই হয়ত সে রাম গরুড়ের ছানার মত মুড অফ করে বসে আছে। বড় বড় ওস্তাদেরা যখন নানান অজুহাত দিচ্ছেন, তখন বড়বাবু নিজেই গন্ধ শুঁকে বিচার করে বললেন, "গন্ধ তো নয় মন্দ"। এখন তার কড়া হুকুম, খোলা রাখতে হবে জিম, আর চুল ছাঁটার সেলুন। এই দুটোকেই অবশ্য এসেনশিয়াল-সার্ভিস বলে ধরে নেওয়া যায়। জিম ও সেলুনে গিয়ে সুন্দর না হতে পারলে ট্যাঁসগরুরা টিক্-টিক্ করবে কি করে? এই প্যানডেমিকের বাজারে এই কথা কেউ ভেবে দেখেছে? গরু বলে কি আর মানুষ নয়?

এত সব গণ্ডগোলের মধ্যে টাক চূড় নগরের তিন বুড়ো পণ্ডিত হুজুর জানালেন এই ভাইরাসটি বেশ "সৎপাত্র"। আক্রান্ত দের মধ্যে যখন মাত্র ২%-৪% মারা যাছে, "এমন কি আর মন্দ ছেলে"। শত হোক এই ভাইরাসটির জন্যই তো আজ আকাশের রঙ ফিরেছে, এটাই হয়তো দরকার ছিল। বাবুরাম সাপুড়ের সাপের মতই এই ভাইরাসটির "নেই কোন উৎপাত-খায়ে শুধু দুধ ভাত"। পটা-পট্ রুগি ধরে টপা-টপ্ স্যানিটাইজার গিলিয়ে দিলেই সব ফিট্-ফাট্ হয়ে যাবে। ভাইরাস থেকে ব্যাকটেরিয়া সব দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম বলে পালাবে।

সত্যি, চারিদিকে সব কাণ্ড যত দেখি, তত মনে হয় আমরা আজকাল আবোল-তাবোলের দেশে আছি। স্বাভাবিকের থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি আজ আমরা। এরকম একটা সময়ের কথা কল্পনা করেই হয়ত সুকুমার রায় আবোল-তাবোল লিখে গেছেন। তা না হলে প্রায় একশ বছর আগের লেখা আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়ে কি করে? খুড়োর কলে এখন ভ্যাক্সিন ঝুলছে, সেই কলের জোরেই আজ মানবজাতি তার দিকে দ্বিগুণ বেগে ছুটছে।

এই আবোল-তাবোলের দুনিয়াতে দেশ ছেড়ে আমেরিকায় পড়তে বা চাকরি করতে আসা আমার মত অনেকেই পরেছে ভারি মুশকিলে। কারুর রিসার্চ স্টাইপেন্ড বন্ধ হয়ে গেছে, অনেকেরই চাকরি গেছে। সব মিলিয়ে, ব্যাগ ভর্তি বই আর বুক ভর্তি আশা নিয়ে স্বপ্নের দেশে পাড়ি দেওয়া অভিবাসীদের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। স্বপ্নের দেশটা যে নিজের দেশ নয়, সেটা মাঝে মাঝেই টের পাচ্ছি। তাও সব মেনে আর মানিয়ে নিয়েছি, কিন্তু এই ভাবে দুর্গা পুজোর আড্ডা আর খাওয়া-দাওয়া মিস হয়ে যাওয়াটা মেনে নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। আসলে বাঙালি তো, তাই "খাই খাই" টা কমে নি। ইশ, গুপি-বাঘার আর ভূতের রাজা যদি আজ থাকতো! তাহলেই "মণ্ডা মিঠাই পোলাও, জলদি লাও জলদি লাও"! কিন্তু আমেরিকা এসে প্রচণ্ড দাপটে ইংরিজি বলার ফাঁকে গুপি-বাঘা আজ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। হয়ত কোন মেঘের প্রাসাদে বসে মণ্ডা-মিঠাই খাচ্ছে আর বলছে, "কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়"।

শ্যামা মা কি আমার কালো রে...

ব্রজেশ পাকড়াশী

সনাতন ধর্মে ঈশ্বরের রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে বহুকাল থেকে আপাত: বিরোধী ধ্যান ধারণা ও বিতর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।
সাধক রামপ্রসাদের পথ অনুগামী অষ্টাদশ শতাব্দীর (১৭৬৯- ১৮২১ খৃ:) বাংলার ভক্ত কবির গানে মা কালীর রূপ বৈচিত্র্যের বর্নণায় বিহ্বলতা অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

শ্যামা মা কি আমার কালো রে
লোকে বলে কালি কালো
আমার মন তো বলে না কালো।
.....
শ্যামা কখনও শ্বেত কখনও পীত
কখনও নীল ও লোহিত রে
মায়ের সে ভাব কেমন বুঝিতে না পারি
ভাবিতে জনম গেলো রে।
শ্যামা কখনও পুরুষ কখনও প্রকৃতি,
কখনও শুনাকার হে,
মায়ের সে ভাব ভাবিয়া কমলাকান্ত
সহজে পাগল হল রে।

এই ভক্তি গীতিতে প্রচ্ছন্ন কবির মানসিক দ্বন্দ্ব ও ভাব বিহ্বলতার বিশ্লেষণের আগে আমাদের ফিরে যেতে হবে সনাতন ধর্মের ইতিহাসের আদি পর্বে।

বৈদিক যুগের প্রারম্ভ থেকেই ঋষিদের চিন্তাধারায় উঠে এসেছিলো জটিল প্রশ্ন - ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে। ঈশ্বর আছেন না নেই? যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যায়, তাঁর কি প্রকৃতি এবং তাঁর সঙ্গে জীব জগতের কি সম্পর্ক? তিনি কি সাকার না নিরাকার? তিনি কি অদ্বিতীয় শক্তি না বহু রূপে প্রতিষ্ঠিত?

ঋগ্বেদে (৪৫০০ খৃ: পূ:) এবং বিশেষ করে বৈদিক যুগের শেষের দিকে উপনিষদের রচনা কালে (আনুমানিক ৯০০-৫০০ খৃ: পূ:) ঋষি মানসে প্রতিষ্ঠিত হয় এক ও অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের ধ্যান - "ব্রাহ্মণ"। তিনি "একমেব অদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য উপনিষদ), যদিও তিনি আরাধ্য হন বহু নামে - "একং সদ বিপ্রা বহুধা বিদন্তি" (ঋগ্বেদ)। তিনি অচিন্তনীয় শক্তি ও অসীম পূর্ণ ব্রহ্ম। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎস। বিরাট এ সৃষ্টির বিভাজনোত্তরেও তিনি পূর্ণতার গৌরবে বিরাজমান-
"পূর্ণমদ: পূর্ণামিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব অবশিষ্যতে।" (ঈশোপনিষদ)।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে তিনি নিরাকার নির্গুণ। অখন্ড মণ্ডলাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু পরমাণুতে তাঁর ব্যাপ্তি- " অখণ্ড মন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্"। সর্ব জীব সৃষ্টির আত্মার অন্তর তম স্থানে তাঁর অবস্থান। এই আত্মা এবং পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। তিনিই সচ্চিদানন্দ (সত্- শুদ্ধ সত্ত্বা), (চিত্- জ্ঞান) এবং আনন্দের পূর্ণ রূপ। তিনি সমভাবে সমগ্র সৃষ্টজীবে অধিষ্ঠিত এই একাত্ম ভিত্তিক ধারণায় সর্ব জীবজগৎ এক সূত্রে গ্রন্থিত।

উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তায় এই আত্মন-ব্রাহ্মণের একতার অনুভূতিই মোক্ষলাভের মার্গ। বিভিন্ন উপনিষদে একই বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

অয়ং আত্মা ব্রহ্ম (মাণ্ডুক্য উপনিষদ)
তৎ ত্বম অসি (ছান্দোগ্য উপনিষদ)
সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য উপনিষদ)
অহং ব্রহ্মাস্মি (বৃহদারণ্যক উপনিষদ)

অনুরূপ বেদান্তের বার্তা বিস্তৃত আছে ১১২ টি উপনিষদের রচনায়। এই বেদান্তবাদ বিশেষ করে সংকলন করেন শ্রী শংকরাচার্য্য (অষ্টম শতাব্দী)। স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন অদ্বৈত বেদান্তবাদের মতাবলম্বী ও অনুসারী এবং বিশ্বময় অদ্বৈত বেদান্তের বাণী প্রচারের প্রচেষ্টা করে গেছেন বেদান্ত মঠের মাধ্যমে।
এই উচ্চ দার্শনিক মতাদর্শকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে "জ্ঞানাশ্রয়ীবাদ"।
অন্যদিকে দ্বৈত বেদান্ত দর্শনের "প্রেমাশ্রয়ী" আরাধনার চিন্তাধারার অবতারণা করলেন শ্রী মাধবাচার্য্য, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। দ্বৈত বেদান্ত মতে সৃষ্ট জীবের আত্মন ও পরমাত্মন ব্রাহ্মণ সমস্তরে অবস্থিত নয়। পরমাত্মনের সান্নিধ্য ও অনুভূতি সম্ভব একমাত্র ভক্তের ভক্তিভাবে, ঈশ্বর চিন্তায় ও প্রার্থনায়। এই প্রেমাশ্রয়ী ভগবৎ চিন্তা সাধারণ মানসে সহজ বোধ্য ও সহজ গ্রাহ্য। এর পরের স্তরের ধারণার বিবর্তন আসে পরম ব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তির চিন্ময় রূপকে প্রতীক হিসেবে আরাধনা করায়। আধ্যাত্মিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই চিন্তাধারা পার্থিব স্তরে। কিন্তু সাধারণ মানসে সহজ হয় ঈশ্বরের সান্নিধ্য কল্পনায় ও ঈশ্বরের উপস্থিতি হৃদয়ে উপলব্ধিতে।
"বাসুদেব ত্বয়া হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্ত অস্মি তথা করোমি" (শ্রীমদ্ভগবত গীতা)।
পৌত্তলিকতার সঙ্গে প্রভেদ এই যে মূর্তিই ঈশ্বর নন। ভক্ত মানসে ঈশ্বর চিন্তার প্রতীক মাত্র।

পুরোহিত যখন পূজার আসনে উপবেশন করেন দেবারাধনায়, তিনি শুদ্ধ মনে উচ্চারিত মন্ত্রের মাধ্যমে দেবতার ধ্যান মূর্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দেবতাকে আবাহন করেন "ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ... যাবৎ পূজাং করোম্যহম্।" পূজান্তে আসে বিসর্জনের মন্ত্র। এরপর মূর্তি শুধু মূর্তিই। তাতে দেবত্ব আরোপ করা হয়না।

বলা বাহুল্য এই সহজ সাধারণ লভ্য প্রার্থনার চিন্তাধারা বহু বিতর্কিত আলোচনার উৎস, যাহা শুধু ভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী জ্ঞানবান পণ্ডিতদের আন্তরিক জিজ্ঞাসা সূত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বাংলায় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিত দের মনেও ছিল গভীর প্রশ্ন। তাঁদের নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টায় উপনিষদ ভিত্তিক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রথা স্থাপিত হল ব্রাহ্ম সমাজ। রাজা রাম মোহন রায়, কেশব সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথএবং আরও বহু বিদ্বজ্জন ছিলেন এই

চিন্তাধারার পুরোধায়। জ্ঞানাশ্রয়ী আরাধনা ভিত্তিক ব্রাহ্ম ধর্ম পেল বুদ্ধিজীবী সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন। সাধারণের মানসিকতায় কিন্তু এই মতবাদ খুব সাড়া পায়নি। তার কারণ মূর্তি পূজার মাধ্যমে সাধারণের মন লাভ করতো পরমেশ্বরের স্পর্শ পার্থিব পরিপ্রেক্ষিতে। তাই প্রেমাশ্রয়ী আরাধনা জনমানসে স্থান পেল জ্ঞানাশ্রয়ী আরাধনার পুরো ভাগে। সত্যাসত্যের প্রশ্ন এখানে নেই। আছে আবেগ মিশ্রিত চিন্তার বিশ্লেষণ।

স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি ছিলেন অদ্বৈত বেদান্তের একান্ত সাধক, তিনি গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন- অতীন্দ্রিয় মহাশক্তি কে উপাসনায় হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের কষ্টসাধ্য। কিন্তু যাঁরা দেবত্ব চিন্তায় দেবতাকে রূপের মাধ্যমে আরাধনা করে তাঁদের আধ্যাত্মিক মার্গে ঊর্ধ্বগতি অনেকটাই সহজ ও সম্ভব হয় অনন্তকে হৃদয়ঙ্গম করতে। যে মাধ্যমেই হোক ঈশ্বর অনুভূতির নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হওয়া মানব হৃদয়ের কাম্য। এক স্তরে সবার চিন্তাধারা থাকতে পারে না এবং সম্ভবও নয়। যে উপায় অবলম্বনেই হোক, সব প্রথাতেই ঈশ্বর চিন্তা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য।

এখানে উল্লেখ্য যে বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের পূর্বে ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের বিমূর্ত উপাসনায় বিশ্বাসী। পরে তিনি মন্তব্য করেন- শ্রী রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে না এলে আমি কোথায় থাকতাম? শ্রী রামকৃষ্ণ যদি মূর্তি পূজার মাধ্যমে পরমেশ্বরের পাদপদ্মে স্থান পেয়ে থাকেন তাহলে এইরূপ ভক্ত সাধক যত থাকেন মোক্ষলাভেচ্ছু জগতের ততই মঙ্গল।

মূর্তির তাৎপর্য নিয়ে বিবেকানন্দের একটা সুন্দর গল্প আছে। পরিব্রাজক হিসাবে যখন তিনি সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করছেন, তখন একবার এসে পৌঁছলেন আলোয়ার খণ্ডরাজ্যে। আলোয়ারের তরুণ রাজা মঙ্গল সিং ছিলেন বিবেকানন্দের ভক্ত ও বন্ধু। কিন্তু মূর্তি পূজাকে তিনি কুসংস্কার হিসেবে গণ্য করতেন। বিবেকানন্দ তাৎক্ষণিক কোন উত্তর দেন নি।
একসময় তিনি দরবার গৃহে পৌঁছলেন। দেখলেন, দেওয়ালে টাঙানো রাজার অনেক ছবি পূর্ণ রাজবেশে। বিবেকানন্দ তখন রাজার সাক্ষাতে তাঁর মন্ত্রীকে একটি ছবি নামাতে বললেন। ঐ ছবিটি তখন মেঝেতে ফেলে তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন- এই ছবিটায় থুতু ফেলতে পারবে? হতভম্ব মন্ত্রী বললেন এই অন্যায় অনুরোধ তার পক্ষে কি করে রাখা সম্ভব? সেটা হবে রাজার প্রত্যক্ষ অপমান! বিবেকানন্দ তখন রাজাকে বললেন- এই ছবিটা এক টুকরো কাগজ বৈ তো নয়! কিন্তু সবার চিন্তায় এর নেপথ্যে আছে আপনার অস্তিত্বের ইঙ্গিত। সব প্রতিকৃতিই এই ধারণা বহন করে। মূর্তি পূজার তাৎপর্য এইখানেই।

দেবদেবীর প্রতিমার বাহ্যিক রূপ ও বর্ণের ব্যঞ্জনা অবশ্যই রূপক। কমলাকান্তের গানে "মা কি আমার কালো" এই কল্পনার নেপথ্যে আছে পুরাণ বর্ণিত উপাখ্যান।

কালিকার প্রচলিত মূর্তি আনন্দময়ী পার্বতীর ক্রুদ্ধ দানব দলনী রূপ। গৌরবর্ণা পার্বতী তাই হলেন কৃষ্ণবর্ণা কালিকা। তাঁর মূর্তি শায়িত মহাদেবের বক্ষের উপরে দণ্ডায়মান, বিব্রত মানসে জিহ্বায় দাঁত কেটে। আখ্যান অনুসারে, দানব বধের পরেও রোষ সংবরণে অসমর্থ কালিকার রণশেষের এই মূর্তি।
জগৎ কল্যাণের উদ্দেশ্যে দেবতাদের অনুরোধে মহাদেবের ওপর ন্যস্ত ছিল ক্রোধ রিপু দমন করে মা কে শান্ত করবার ভার। মহাদেব কালিকার সেই রোষকে প্রতি শক্তি দিয়ে রোধের প্রচেষ্টায় না গিয়ে নিজেকে শায়িত করলেন রণক্ষেত্রে মায়ের গতিপথে। হঠাৎ পদতলে শায়িত মহাদেবকে দেখে মা হলেন নিরস্ত ও লজ্জিত। কোনও শক্তির সম্মুখীন হয়ে নয়, জাগ্রত ব্যবহারিক মূল্য বোধে।

মা কালিকা তবুও সেই মুহূর্তেও সচেতন- তিনি যে করুণাময়ী, তাই ডান হাতে তাঁর অভয় ও বরমুদ্রা এবং বাম হাতে অশুভনাশের প্রতীক- খড়্গ ও দানবের ছিন্নমুণ্ড। এই মূর্তিতে মা বিদ্যমান, একাধারে বিপদতারিনী এবং যুগপৎ অভয়দাত্রী ও বরদায়িনী রূপে। মায়ের এই রূপেই মুগ্ধ কমলাকান্ত।

কমলাকান্তের গানে আবার তাঁর আকুতি ময় প্রার্থনায় প্রকাশ পায় তাঁর বিহ্বলতা ও বিভ্রান্তি। মা পুরুষ না প্রকৃতি এই অনিশ্চয়তায় দোলায়িত কবির মন। কালিকা ব্রহ্মময়ী, পরম ব্রহ্ম তিনি। পুরুষও নন, প্রকৃতিও নন। কবির বিহ্বলতা তাই স্বাভাবিক। কোন বর্ণে তিনি রঞ্জিত? - কৃষ্ণ, শ্বেত, নীল, পীত বা লোহিত? অতীন্দ্রিয়, বর্ণহীন, অতীন্দ্রিয় দৃশ্যের বাস্তবায়নে সাধক শিল্পী পরিবর্তনশীল ভাব ও ভক্তিরসের বর্ণে তাঁকে চিত্রিত করেন কল্পনার তুলিতে। পরম ব্রহ্মের কোনও রূপ নেই, রঙ নেই। ভক্তের কল্পনা তাকে দেয় রূপ ও রঙের বৈচিত্র।

সম্পূর্ণ অন্য পরিপ্রেক্ষিতে মনে পড়ে যায় কবিগুরুর "আমি" কবিতাটা। যার আংশিক উদ্ধৃতি মনে হয় এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক।

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।"

অর্থাৎ সৌন্দর্যের অনুভূতি দ্রষ্টার অনুভবের স্পর্শবোধের ওপর নির্ভরশীল। পর্যবেক্ষক পার্থিব বা অপার্থিব সৃষ্টিকে যে অনুভবে গ্রহণ করতে চান, তাই রূপায়িত হয়ে ওঠে আপন হৃদয়ের উজ্জ্বলতায়।

সাধক কবি কমলাকান্ত মায়ের রূপ- বর্ণ- প্রকৃতির অনিশ্চয়তার দ্বন্দ্বে দোলায়িত থেকেও তাঁর রচনার মধ্যে রেখে গেছেন সব জিজ্ঞাসার উত্তর:

"হৃদি পদ্ম করে মোর আলো"
মা পরমাত্মনের ধ্যানরূপ
তিনি পুরুষ প্রকৃতির ব্যঞ্জনার ঊর্ধ্বে
তিনি কৃষ্ণ- শ্বেত-পীত-নীল-লোহিত এবং সব বর্ণেই রঞ্জিত
আবার কখনও বা বর্ণহীন শূন্যাকার।
- সবই ভক্তের অন্তর্দৃষ্টি নির্ভর।
তবুও এই অনিশ্চয়তার তিমিরের বিহ্বলতায় সকল ভক্ত-মানসই স্বভাবকবি কমলাকান্তের সহযাত্রী ও সহমর্মী।

এই শীত এই বর্ষা

তিতাস মাহমুদ

সারাটা দিন আজ অলস কাটলো। আজ শনিবার। আমার হাসপাতালে কাজ নেই। বাইরে সোনা ঝরা রোদ উঠেছে। অনেকটা বাংলার শীতের সকালের মতো। আমি মাকে নিয়ে পেছন বারান্দায় সূর্যের দিকে পিঠ ঠেকিয়ে সকালের নাশতা করলাম। দুই স্লাইস ইংলিশ মাফিন সাথে ডিম ভাজা। এদেশে গরম গরম ভাপ ওঠা পিঠা পাবো কোথায়!

আরো খানিকটা বসবো ভেবে কফি কাপটা এগিয়ে নিলাম। কিন্তু কনকনে শীতল বাতাস বইছে। আমার মা এমন বাতাসে অভ্যস্ত নন। তিনি সবেমাত্র দেশ থেকে এসেছেন। কথা ছিল অল্প কিছুদিন ছেলেমেয়ে দের সাথে এ বাড়ি ও বাড়ি কাটাবেন। কিন্তু সারা পৃথিবী করোনা মহামারিতে আক্রান্ত এবং অচলাবস্থা। তাঁর বাড়ি ফেরা অনিশ্চিত প্রায়। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকেন। বিদেশ বিভুঁইয়ে যাপন যতই উন্নত হোক, কোন জীবন নেই। জীবনের শেষ তৃতীয়াংশে এসে চাকচিক্য যাপনের মোহ নেই আর। আমার মা অস্থির অপেক্ষা করছেন একটি সহজ বাঙালি জীবনের। যেখানে ধান কুড়ানো শালিক বাড়ির দাওয়ায় আসে আবার বারবার।

আমি মাকে নিয়ে ঘরের ভেতরে চলে এলাম। ধীরে ধীরে সূর্যটা মেঘের আড়ালে চলে যাচ্ছে। আজ বিকেলে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে। আমার শরীরটা হঠাৎ ম্যাজ ম্যাজ করা শুরু করলো। গায়ে একটু জ্বর জ্বর ভাব হচ্ছে। মা সেটা টের পেয়ে যান। আমাদের ইন্দ্রিয় পাঁচটি আর মায়েদের বোধ করি গোটা বিশেক। আমার কপালে তাঁর ডান হাতের তালু দিয়ে তাপমাত্রা বোঝার চেষ্টা করেন। আমি সুস্থতার ভান করি। গতকাল আমি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষমূলক ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ইঞ্জেকশান দিয়েছি। আমি বুঝতে পারি শারীরিক এই ব্যথা বেদনা আসলে সেটারই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া।

আমার মা ক্রমাগতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অথচ আগে একটা সময় ছিল তিনি অসম্ভব সাহসী ছিলেন। সংসারের যাবতীয় কাজকর্মে আমাদের টুকটাক সর্দি জ্বর, মাথাব্যথা এসব কে তিনি খুব একটা নজরে আনতেন না। মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে আত্মবিশ্বাস হয়তো কমে যেতে থাকে। অবশ্য আমি তাঁর অনুমতি ছাড়াই ভ্যাকসিন ট্রায়ালে স্বেচ্ছাসেবী হয়েছি। এতে একধরণের ঝুঁকি তো আছেই, এমনকি মৃত্যুরও সম্ভাবনা আছে। আমাকে ছাব্বিশ পাতার শর্তাবলী স্বাক্ষর করতে হয়েছে। সেখানে মারাত্মক সব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা বলা আছে। আমি সেসব কোন কথা মাকে বলিনি। আমি তাঁর পাশে ঘন হয়ে বসি। আমার গায়ের ব্যথা কমে যেতে থাকে। শরীর থেকে জ্বরের ভাব কেটে যেতে থাকে। আমার তখন বাবার কথা মনে পড়ে। আমার মায়ের নাম কামরুননেসা বেগম। এই নামটি ছোট করে তিনি মাকে 'কুমু' ডাকতেন। আমার ছোট পৃথিবীতে এমন সুন্দর করে ভালোবাসতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

মা তখনো মুখটা খানিকটা মলিন করে আছেন। আমি বললাম, 'বাবা বলতেন, জন্মসূত্রে সবারই একটা জীবন থাকে। এতে কোন কৃতিত্ব নেই। মরণের পর যে জীবন বেঁচে থাকে, সে জীবনেই যত সাফল্য।' মায়ের চোখ দু'টো জানালা দিয়ে দিগন্ত রেখা স্পর্শ করেছে। তিনি হয়তো সেখানে তাঁর প্রয়াত স্বামীর ছায়া দেখতে পান। আমি বললাম, 'মা গো, এই ভ্যাকসিন ট্রায়ালে যদি মরেও যাই, আমার কোনো দুঃখ নেই। করোনা মহামারিতে বিপন্ন মানব সভ্যতার এই ক্রান্তিকালে, অন্তত বিজ্ঞানের জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করেছি। তুমি দেখো, আমার মৃত্যুর পরও আমি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো।' আকাশ থেকে চোখ দু'টো নামিয়ে মা আমার চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে গল্ গল্ করে অশ্রু ঝরছে অথচ কী অবাক কান্ড! তাঁর ঠোঁট জুড়ে মিষ্টি হাসির রেখা। কী অসম্ভব পবিত্র আর স্বর্গীয় সে হাসি!

বাইরে ঘন কালো মেঘে বৃষ্টি এসেছে। মনে হচ্ছে বাংলার বর্ষা যেন। আমার পরবাসী জীবন এমনই, এই শীত এই বর্ষা।

20/20 IN 2020

Chandana Sarkar

The year 2020 is significant in my life. My birthday and anniversary both marked a Milestone. Before entering the new decade, I had a lot of dreams and plans. But as we entered this year it became quite apparent that this will be a different year and a lot of apprehensions were there.

20/20 is a powerful metaphor focusing on vision and focus.

"Vision is measured in two ways. One of which is the ability to see. In the 1840s scientists began thinking about standard tests to measure sharpness and clarity of vision at a distance of 20 feet. It was soon determined that to have 20/20 vision means you can see clearly at 20 feet what should ideally be seen from the distance. "(Scott Leonardi, Dec 2019. 2020: The Caymanian Year of Vision).

Vision is also the ability to think about or plan the future to ensure the attainment of your goals. To make our vision come true, Focus is very important, which needs clarifying our minds and practicing better time management.

As we entered the Lockdown Period everything seemed uncertain, especially at the life-stage I am in. It was very frustrating. However, I always like to keep a positive attitude. I decided I am going to make the best use of it.

The first step was to think of the things I always wanted to do and was always interested in learning ways to enrich my day to day life but really never pursued seriously. I have kept a lot of things on the back burner thinking I shall do it later when the time is better, as a result, have a lot of unfinished projects and ideas. I decided to practice what I have often preached to others ---Prioritizing. I really thought of it very seriously and picked up a few projects. I started gathering information for writing a family history using old pictures, this is mainly for my granddaughter who is a product of an immigrant family. I believe knowing family history gives people a sense of belonging. Even though I am far from completing it but starting the framework and gathering relevant information has been very rewarding. My second project was to get back to some literary discussion, not merely reading literature but discussing it from a different perspective. I joined a global webinar with some other Bengalis, there were people from different age groups, different professions, and different life experiences. Under the leadership of a well-known person in this field, we discuss the background, writing, and perspectives of different writers as well as people from other performing and visual arts. Our theme is discussing people's work on their birthdays. This has been very challenging and rewarding for me. My third project was reinventing some cooking recipes. Cooking has always been a passion for me but during this time I really focused on it more. I read a lot of cook books as well as watched different types of cooking shows and tried to apply these techniques and reinvented some according to my liking which really is fun. My biggest achievement so far has been finishing up some of my unfinished craft projects. Along with all these I tried to reach out to people who I really care for, the technology made this possible but we often do not take advantage of it.

So, when I think of what really happened during the lockdown, I can't say everything is bad. Sure, the medical and political Pandemic has been a nightmare but I did achieve a few things too. This actually gave me a mental boost that I can do what I want to, if I focus on it. The year 2020 has taught me not to take things for granted.

Positivity, Prioritization and Perseverance have been the three Ps for me to survive this Pandemic year so far. I realized this is the hindsight of 20/20, which refers to looking back at a situation and having a clearer understanding of it and think of options to make the situation better.

বসুধৈব কুটুম্বকম

অনিল বিশ্বাস (কলকাতা)

এই বিশ্ব একটি পরিবার। বিশ্বের সবাই আমার কুটুম্ব মানে আত্মীয়। আত্মীয় সে যার সাথে আত্মার সম্পর্ক। কাজেই সবাই আমার আপনজন। বিশ্বে সবাই আমি। আমার সামনে আয়না, জীব জন্তু পশু পক্ষী গাছপালা সব আয়না, আর আয়নার সামনে আমি। তাহলে আয়নাতে তো আমাকেই দেখছি।

God is Omnipresent.

যত জীব তত শিব। যিশু বলেছেন -

"Man is the image of God. I and the Father are one"

"একমেবাদ্বিতীয়ম, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। আবার ঈশ্বরই সবকিছুর মধ্যেই বিরাজমান।

আমরা যদি এই আত্ম উপলব্ধি বা জ্ঞান লাভ করতে পারি তাহলে আর আপন পর ভেদ থাকে না। আমি তুমি থাকে না। কেহ অভুক্ত থাকলে আমি কি করে খাই। এই মন্ত্র ভারতের আকাশে বাতাসে অনন্তকাল থেকে বয়ে চলেছে। তাই ভারতের আদর্শ হচ্ছে, খাবার তৈরি করে একভাগ অতিথির জন্য, একভাগ জীব জন্তু পশু পাখির জন্য, একভাগ বাড়ির সকলের জন্য, একভাগ দেবতাদের জন্য, অবশেষে যদি খাবার থাকে তবে নিজের জন্য।

কৃষ্ণ সখা সুদামা পাঁচ বাড়িতে ভিক্ষা করে খাবার বানিয়ে সবাইকে খেতে দেন। কোন দিন ঠিক মতো ভিক্ষা না পেলে শুধু সন্তানদের খেতে দিয়ে সস্ত্রীক জলপান করে দিনাতিপাত করতেন। একদিন সুদামা ভাতের হাঁড়িতে একদানা ভাতের সন্ধান পেয়ে অর্দ্ধেকটা স্ত্রীকে আর অর্দ্ধেকটা দেবতাকে নিবেদন করলেন। কি উদার ও মহান ভাবমূর্তি। এই তো ভারতের চিরন্তন আদর্শ।

এই রকম হাজার হাজার উদাহরণ রয়েছে ভারতে। আমি আমার নিকটতম এক আত্মীয়ার কথা জানি, তিনি দ্বিপ্রহরে সবাইকে খাইয়ে সবে নিজের খাবার নিয়ে বসে প্রথম গ্রাস মুখে পুরতে যাবেন ঠিক তখনই এক ভিখারী এসে বললেন - মাগো আমি গত তিনদিন অভুক্ত। কেউ একটি দানাও খেতে দেয়নি। ক্ষিদের জ্বালায় মরে যাচ্ছি। আমায় একটু ভাত খেতে দেবে মা? ভদ্রমহিলা আনন্দচিত্তে হাসি মুখে ভিখারী কে নিজের খাবার থালাটা দিয়ে দিলেন। নিজে একগ্লাস জল পান করলেন। যেহেতু ঘরে আর কোন খাবার ছিল না।এই হচ্ছে ভারতবর্ষ। এই হচ্ছে বসুধৈব কুটুম্বকম।

আমরা সবাইকে নিয়ে একসাথে বাঁচতে চাই; একা একা নয়। তাই আমাদের ভারতের দুয়ার সকলের জন্য খোলা। আমাদের কাছে সবাই কুটুম্ব আত্মীয়।

অতিথি দেব ভব। অতিথি আমাদের কাছে নারায়ণ। Supreme power, The God, Almighty.

তাই আমরা শিব দেখি। আমরা যেমন দশভুজা দুর্গার আরাধনা করি, তেমনি অন্য দেবদেবী, পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা নদী নালা পাহাড় পর্বতেরও পূজা করি।

Theme একটাই সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন।

আমাদের মূল আদর্শ সমজ্ঞান অভেদ জ্ঞান, ভেদ দর্শন অজ্ঞান। তাই দশভুজা মায়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা - মাগো তুমি আমাদের সমজ্ঞান দাও, বিভেদ কলহ অজ্ঞানতা, রোগশোক, করোনা, মনের ময়লা সব দূর করো। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দাও তোমার অনন্ত অমৃত আশীর্বাদ। সবাইকে সুস্থ সবল নির্মল ও পবিত্র করো।

হে মা, সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে, শরণ্যে ত্রম্ব্যকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে:।
তুমি সকল মঙ্গল বিধাতার মঙ্গল বিধায়িত্রী, তুমি কল্যাণী, তুমি সর্বসিদ্ধি বিধায়িনী, তুমি আশ্রয় দায়িনী, তুমি ত্রিনয়না, তুমি গৌরী, হে নারায়ণী তোমায় নমস্কার।

অভয়া শক্তি বলপ্রদায়িনী তুমি জাগো

শারদীয়ার হার্দিক শুভেচ্ছাসহ

সুজাতা মিএ,

সন্ধ্যা, লক্ষীনারায়ণ, দেবলীনা,

সুদেষ্ণা, দেবব্রত ঘোষ

ভালবাসার উত্তরাধিকার

দেবপ্রিয়া গোস্বামী

জীবনের বাস্তবিক চলচ্চিত্রে সব চরিত্র কাল্পনিক নাও হতে পারে তেমনই কিছু ব্যক্তিত্ব, কিছু সম্পর্ক থেকে যায় যারা বর্তমানের মুঠো ফোন, তথ্য প্রযুক্তি, মুখ গ্রন্থ বা সামাজিক মাধ্যমগুলির সাথে পরিচয় পূর্বেই পুরোনো স্মৃতির হারানো পাতায় অসম্পূর্ণ অধ্যায়ের ভাঁজ হয়ে থেকে যায় আজীবন।

॥ ১ ॥

শ্রীময়ী প্রত্যেক দিনের মতো অফিস থেকে ফেরার পথে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সন্ধ্যার থেকে মুষলধারে বৃষ্টির কারণে যানবাহনের সংখ্যা অন্যদিনের তুলনায় বেশ কম। সেজন্য ভিড়ে ঠাসা পরপর ক'টা বাস ছাড়তে বাধ্যও হয়েছে। বৃষ্টির রাত আর অপেক্ষা না করে কেয়াতলা রোডের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করেছে শ্রীময়ী। রাস্তায় যা পাওয়া যায়। গত কয়েক ঘন্টার বৃষ্টিতেই রাস্তার বেহাল অবস্থা। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই চেনা গলায় তার নাম শুনে পিছনে ফিরে তাকায়, কেউ কি ডাকছে তাকে? বুঝতে পারে না। দ্যাখে নন্দিনী এক মুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। একদম সামনে এসে দাঁড়াতে নজর যায়। "কি রে শ্রী! তখন থেকে ডাকছি, শুনতেই পাচ্ছিস না।"

শ্রীময়ী হেসে বলে "তু-মি নন্দিনী দি! আমি বুঝতেই পারিনি গো, শুনেছি ডাকটা, কিন্তু কোন দিক থেকে আসছে বুঝতে পারিনি। আসলে মাথায় সবার ছাতা আর বৃষ্টির একটানা শব্দে সব মিলেমিশে গেছে।" জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারে এখানে একটি দোকানে কিছু জিনিস কিনতে এসেছে। গায়ে বৃষ্টির জল মুছতে মুছতে খেয়াল করে নন্দিনীর পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, এর আগে তাকে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। তার প্রশ্ন সূচক মুখ দেখেই নন্দিনী বলে "ওর নাম সাংমা, আমার কাছে থাকবে বলে এসেছে। ওরই ক'টা জিনিস কেনার ছিল। মেয়েটির বয়স খুব বেশী হবে না ১৬ কি ১৭ ই হবে বড়ো জোর। সুঠাম গঠন, ফর্সা রঙ, মুখটি দেখে নেপালী বা পাহাড়ি আদিবাসী সম্প্রদায়ের বলেই মনে হয়। রাস্তার ঐ পাশে নন্দিনীর ড্রাইভার অপেক্ষা করছে তাকে গাড়ি ঘুরিয়ে আসতে নির্দেশ দেয়। গাড়ি সামনে আসলে নন্দিনী বলে "নে উঠে পর, বাড়ি যাচ্ছিস তো? আমি পৌঁছে দিচ্ছি।" শ্রীময়ী উঠে পরে দেরি না করে। তারপর ব্যস্ত হয়ে পরে এদিক ওদিকের কথায়। আজকাল শ্রীময়ীর প্রায়ই নন্দিনীর সাথে দেখা হয় যাতায়াতের পথে। নন্দিনী একটি NGO সংস্থার সাথে যুক্ত আছে। তবে বেশ কিছুদিন হল দেখা হয়নি। শ্রীময়ী জিজ্ঞাসা করে "তোমায় অনেক দিন দেখিনি যে! তুমি যাচ্ছো না?" নন্দিনী জানায় "না রে বেশ ক'দিন যেতে পারিনি, ব্যস্ত ছিলাম।" চিন্তার সুরে প্রশ্ন করে "বাড়ির সবাই ভালো আছে তো?" নন্দিনী জানায় "হ্যাঁ, সবাই ভালো।" দেখে মনে হল খুব ক্লান্ত সে। অনেক কথা বলার আছে। জিজ্ঞাসা করে "শ্রী, তুই আসতে পারবি আমার ওখানে একদিন?" ড্রাইভারের দিকে ইশারা করে দেখায়, "গাড়িতে সব বলা যাবে না। তোর শনিবার সময় হবে?" দেখে খুবই চিন্তিত মনে হয় নন্দিনীকে। শ্রীময়ী জানায় শনিবার বিকাল ৫ টা নাগাদ যাবে তার ওখানে। দীর্ঘদিনের যাতায়াত নন্দিনীদির সাথে, বলা যেতে পারে বহুদিনের পাড়াতুতো বন্ধু তারা। শ্রীময়ী ও নন্দিনীর বয়সের তারতম্যে "দিদি" সম্বোধনের উপস্থিতিটি বর্তমান হলেও বন্ধুত্বের সম্পর্কে তা কখনই ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারেনি। বন্ধুত্বের সম্পর্কে উঠে আসত দৈনন্দিন রোজনামচা থেকে শুরু করে জীবনের জানা অজানা টানাপোড়েনের সকল বিষয়েই।

॥ ২ ॥

শ্রীময়ী, সেন বাড়ির ছোট মেয়ে, ইউনিভার্সিটির গণ্ডি শেষে বেশ কিছু সরকারী চাকরির প্রচেষ্টা করেও ভাগ্যে শিকেটি ছেঁড়েনি। অগত্যা সরকারী পরীক্ষাগুলি দেওয়ার পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থায় অতি অল্প বেতনে কাজ করে,পাশাপাশি দুটো বাচ্চাকেও বাড়িতে গিয়ে পড়ায়। ছোট বয়সে মা চলে যাওয়ার পর বাবা একা মানুষ করে তাদের ভাই বোনদের। পরবর্তীকালে পড়াশোনার সুবিধার কারণে দাদা বৌদির সংসারে থাকতে শুরু করে। প্রবল আত্মসম্মান বোধের জন্য শ্রীময়ী হাতখরচ বা নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান যাতে সে নিজেই দিতে পারে তার জন্য আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা সর্বদাই করে থাকে। কিন্তু বাড়ির ছোট আর প্রতিষ্ঠিত অতীব সচেতন দাদার বোন হওয়ার কারণে গাড়ি করে কাজের জায়গায় পৌঁছে দেওয়া কিংবা অযথা ছাত্রীর বাড়ির সামনে বোনের অপেক্ষায় গাড়ির হর্ন বাজানো শুধু তাকেই অপ্রস্তুত করতো না ছাত্রীর বাড়ির লোকেরাও বিব্রত বোধ করতো। বিদেশে ব্যাপারটি জলভাত হলেও কলকাতা তখনও বিষয়টিতে ধাতস্থ হয়ে ওঠেনি যে গাড়ি করে বাচ্চাকে পড়াতে আসেন কেউ। এদিকে আবার শ্রীময়ীর বিয়ের জন্য বয়স বেড়ে যাচ্ছে, এতোদিন বাড়ির লোককে পড়াশোনা, চাকরির অজুহাতে ঠেকিয়ে রাখলেও এখন তারা ব্যাপারটিতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। বেশীরভাগ শনি বা রবিবার গুলো তার পাত্র বা পাত্রপক্ষের প্রশ্নবিচিত্রার উত্তর করতে চলে যায়। হাতেগোনা বন্ধুর সংখ্যায় প্রায় সকলেই বিবাহিত, কাজেই বিষয়টি অনুঘটকের ন্যায় পারিবারিক চাপ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছিল।

॥ ৩ ॥

নন্দিনী সাধারণ সচ্ছল পরিবারের মেয়ে ছিল। নন্দিনীর বাবা নিজে অধ্যাপক ছিলেন এক সময়ে পরে অবশ্য একটি দৈনিক পত্রিকার সাথে যুক্ত হন। ভাই বোন বলতে ছিল তারা এক ভাই ও এক বোন। বাবার কঠোর অনুশাসনে পড়াশোনার পাশাপাশি চলতো শিল্পচর্চাও। একমাত্র দাদা গ্লাসগোতে মেডিসিন পড়তে গিয়েছিল। পরবর্তী কালে পেশাগত এবং বৈবাহিক কারণে সেখানেই থেকে যায়। নন্দিনীও বেশ মেধাবী ছিল, ইচ্ছা ছিল আইন নিয়ে পড়ে ওকালতি করবে। সেই হিসাবেই চলছিল সবকিছু। কিন্তু হঠাৎই একদিন তার বাবা চলে যান। আকস্মিক পিতৃহারা নন্দিনীর জীবন রাতারাতি বদলে যায়। বাবা চলে যাওয়ার পর মা'ও অসুস্থ হয়ে পড়েন, শয্যাশায়ী অবস্থা দেখে নন্দিনীর দাদা তার মাকে কিছুদিনের জন্য সাথে নিয়ে যায়। তবে তার যাওয়া সম্ভব নয় তাই মামার কাছে থাকতে শুরু করে, কিন্তু কিছু হিতাকাঙ্খী আত্মীয়স্বজনরা প্রত্যহ জানান দিতে থাকে "কন্যাদায় বড় দায়", সাথে আনতে থাকে বিবাহ প্রস্তাব। অবশেষে পূর্ব পরিচিত কলকাতার বেশ

নামকরা ধনী ব্যবসায়ী পরিবারে একমাত্র পুত্র দিব্যজ্যোতি রায় এর সাথে নন্দিনীর বিয়ে হয়ে যায়। প্রথম দিকে পড়াশোনা চালিয়ে গেলেও বছরখানেকের মধ্যে তাদের জীবনে আসে তাদের ছেলে অভ্রজ্যোতি। আর কি! নন্দিনীও জীবনের নতুন ছন্দে, আনন্দে মেতে ওঠে ওদের ছেলেকে নিয়ে। চোখের পলকে ঝাপসা হয়ে উবে যায় বেশ ক'টা বছর। তার মধ্যেই কেনা হয় সাদার্ন এভিনিউ এর বিলাস বহুল বহুতলের ফ্ল্যাট। অল্পদিনের মধ্যেই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সাজিয়ে তোলে নন্দিনী নতুন ফ্ল্যাটের সুখী গৃহকোণ। রঙিন স্বপ্নের মোড়কে ভালো-বাসা র প্রতিটি কোণে রঙের ছোঁয়া লেগে থাকলেও ব্যস্ততা আর দায় ভারে ততদিনে নন্দিনী দিব্য-র সম্পর্কে মলিনতা যোগ হয়েছে। কয়েক বছরে দিব্যর ব্যবসার পরিধির সাথে সাথে কর্মব্যস্ততা অনেক গুণে বেড়ে যায়। প্রায়শই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বিদেশেও যেতে হত। নন্দিনীর অবশ্য খুব ইচ্ছা করত দিব্যর সাথে দেশের বাইরে বেড়াতে যাওয়ার কিন্তু অভ্রর পরীক্ষা নয়তো এটা, সেটা লেগেই থাকতো। প্রথম প্রথম দিব্য সাথে যাওয়ার কথা বললেও পরের দিকে অভ্রর কথা ভেবে বলাও ছেড়ে দিয়েছিল। নন্দিনী দিব্যর তোলা গুটিকয়েক ছবি দেখেই মনে মনেই আন্দাজ করে নিতো মার্চ মাসের বরফে ঢাকা লন্ডন শহর কতটা মোহময়ী, নিউইয়র্কের ঝলমলে আলোর ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে কেমন লাগে কিংবা আইফেল টাওয়ারের উচ্চতায় প্যারিস শহরকে কতটা রোমান্টিক মনে হয়।

অভ্র একটু বড় হলে নন্দিনী নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বজায়ে একটি বেসরকারী ব্যাঙ্কে কাজ নেয়। কিন্তু দিব্য কর্মসূত্রে বিভিন্ন সময়ে বাইরে থাকায় কাজের লোকের ভরসায় রাখা অভ্রকে নিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দিব্যর মতে "কি দরকার চাকরি করার, ছেলেকে দেখে রাখাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত"। তাই খুব বেশী দিন আর চাকরিটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। নিজেকে ব্যস্ত রাখতে, সবার সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে একটি NGO সংস্থায় যোগ দেয়। নন্দিনীর ব্যক্তিত্ব এবং বলিষ্ঠ চরিত্র অল্পদিনের মধ্যেই কর্মক্ষেত্রেও সকলের নজর কাড়ে। অবশ্য সেবিষয়ে অনেক তির্যক মন্তব্যও তার কানে আসতে থাকে। যেমন '"ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো", "উচ্চবিত্তের ভালো টাইমপাসের জায়গা" ইত্যাদি ইত্যাদি। সব মিলিয়ে জীবনের স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে বেশ ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিল সে।

|| ৪ ||

শ্রীময়ী শনিবার যথাসময়ে পোঁছে যায় নন্দিনীর বাড়ি। অন্যদিনের মতোই দিব্য, অভ্র দুজনেই তখন বাড়ি নেই, তাই সোজা ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায় নন্দিনী। শুরু করে প্রতিবেশিনী সুজাতা বোসের ঐতিহাসিক আগমনের কথা দিয়ে।

ড: সুজাতা বোস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বয়স তা প্রায় সত্তরোর্ধ হবে। পুরনো বসত বাড়িটিতে প্রোমোটিং চলছে বলে ছেলের কাছেই আছেন এখন। তবে ওনার আর একটি মেয়ে আছে, দেরাদুনে থাকে। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়েও সময় কাটিয়ে আসেন। কথা মাধ্যমে জানা যায় তিনিই এক সপ্তাহ আগে সাংমাকে নন্দিনীর কাছে নিয়ে আসেন। সাংমার ১৭ কি ১৮ বছর বয়স, দার্জিলিঙে একটি টি এস্টেটে তার মায়ের সাথে কাজে করতো। মুখটা পাহাড়িয়া চ্যাপ্টা ভাবের হলেও বেশ চোখে পড়ার মতো গঠন তার। দুর্ভাগ্যবশত এস্টেট এর মালিকের ছেলের কুনজরে পরে যায়। তারপর যখন জানতে পারে অন্ত:সত্ত্বা তখন দিনমজুর মাকে সাথে গিয়ে মালিককে জানিয়েছিল কিন্তু কোনো ফল হয়নি। পুলিশের কাছে যাবে বললে তাদের চা-বাগানের কাজটাও চলে যায়। এখন প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে। হয়তো অভাব মানুষের লড়াই করার ক্ষমতাকে বেঁধে দেয়। কোনো রকমে তাই প্রাণ বাঁচিয়ে কলকাতায় ওর মামা অর্থাৎ ড: সুজাতা বোসের ড্রাইভার বাবু'র কাছে এসে উঠেছে। বাবু বহু বছর কলকাতায় বোস বাড়ির ড্রাইভার হিসাবে পরিচিত। প্রথমে বলে ক'মাস থেকে পরে চলে যাবে সাংমা, তাই একটা কাজের খুব প্রয়োজন ওর । বিপদে পড়ে নন্দিনীর কথাই ড: বোসের মনে হয়েছে। পাহাড়িয়া কর্মঠ,পরিশ্রমী সাংমা বেশ চটপটে স্বভাবেরও তা নন্দিনী ক'দিনেই বুঝেছে। নন্দিনীর সাথে সাংমা ডাক্তারের কাছেও যায়, ডাক্তারের কথা অনুযায়ী বেশ অনেকটাই দেরী হয়ে গেছে সুতরাং বাচ্চার জন্য অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই। সাংমা কান্নাকাটি করে জানায় বাচ্চাটিকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করতে চায়। নন্দিনী ওকে যদিও বুঝিয়েছে "পড়াশোনা শেখাবি, এমন করে মানুষ করবি যাতে ওর সরলতার সুযোগ আর কেউ না নেয়, মানুষ করবি।" উত্তরে সে জানায় "তাদের সমাজ বিবাহ বহির্ভূত সন্তান ও তাকে কখনই মেনে নেবে না। অভাবের সংসার কি হয় দিদি তুমি বুঝবে না। সত্যিই হয়তো! নিজের সমস্যায় অভিযোগ থাকলেও অভাব কি জিনিস তার হয়তো জানা নেই। তাই মানুষ হিসাবে, একজন মেয়ে হয়ে সাংমার পাশে দাঁড়ায়। আইনের সাহায্য নিতে বললেও রাজি হয়না সাংমা। এদিকে এসবের কোনো কিছুই দিব্যর আড়ালে হয়না। নন্দিনীর পরোপকারী মনোভাব বা কারোর অসহায়তাকে আঘাত না করতে চাইলেও ভবিষ্যতের কথা আশঙ্কা করে দিব্য সাংমাকে রাখতে রাজি হয় না।

এমনকি অভ্রও আছে। যদিও এবছরে বাইরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সুযোগ পাওয়ার পর থেকে কলেজ হোস্টেলে থাকে তবে সে ছুটিতে বাবা মা'র কাছে বাড়ি আসে। কিন্তু তবুও বাড়ি রাখতে যাবে কেন? NGO র পরিচিত হোম গুলিতে ব্যবস্থা করলেই তো হয়। দিব্যর কথায় বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম কথা বলবে সেখানে দিব্য নন্দিনীর সম্পর্ক তথা চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। নন্দিনীর দায়বোধের কাছে দিব্যর আশঙ্কা গুলি অযথা ভাবনা মাত্র শোনায়।

|| ৫ ||

এরপর মাস তিনেক বাদে সাংমার একটি মেয়ে হয়, নন্দিনীই তার ডাকনাম রাখে মোমো। ফর্সা টুকটুকে, ছোট্ট চোখ নাক বিশিষ্ট নরম তুলতুলে মোমো পুরো যেন একটা পুতুল। ঠিক যেমনটা মনের মাঝে ইচ্ছা হয়েছিল নন্দিনীর কিন্তু ব্যস্ততার ভিড়ে মনেই চাপা পড়েছিল। ভগবান তাই হয়তো তার কাছে মোমোকে পাঠিয়েছেন। হওয়ার মাস খানেক পরেই সাংমা চলে যেতে চায়। পা জড়িয়ে কেঁদে বলে "মোমো কে তুমি রাখো দিদি। তোমার থেকে ভালো করে মানুষ ওকে কেউ করতে পারবে না।" এতটুকু দুধের শিশুকে অন্তত আর কিছুদিন বোতলে অভ্যস্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার অনুরোধ করে নন্দিনী। যদিও বোঝে সাংমার জন্য এক একটা দিন কতটা কঠিন হয়ে পড়ছে। এরমধ্যে একদিন সকালে আবিষ্কার করে সাংমা চলে গিয়েছে। ড্রাইভার বাবু নিজেই এসে হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বলেছে সারাজীবন নন্দিনীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

নন্দিনী চাইলেও এভাবে অন্যের বাচ্চা রাখা যায় না। দিব্যকে জানায় মোমোকে দত্তক নেওয়ার কথা। দিব্য ভালোই আন্দাজ করেছিল কিভাবে দিনের পর দিন নন্দিনী মায়ার বাঁধনে আটকে পড়েছে। কিন্তু বাচ্চাটিকে রেখে সাংমার চলে যাওয়াতে পূর্বাভাস মতোই জীবনে শুরু হয় ঝড়, যে ঝড়ে প্রত্যাশিত সামাজিক আশঙ্কাগুলো গৌণ হয়ে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় অপ্রত্যাশিত কারণ গুলোই।

দিব্য নন্দিনীকে বলে "এলাকার তো কারোর জানতেই বাকি নেই। যে লোকগুলো আজ তোমায় মাথায় করছে, বাহবা দিচ্ছে, তারাই হয়তো একদিন ছোট্ট শিশু মনে আঘাত হানবে। কখনও ভেবে দেখেছে কি অবস্থা হবে? সামলাতে পারবে

তো সেদিন? আগলাতে পারবে তো?'' 'ওর লেপচা অধিবাসী চেহারা দেখে সকলে ওকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করবে তখন? আর যদি সাংমা বা ওর পরিবারের কেউ এসে দাবী করে?'' নন্দিনীর কাছে স্পষ্ট উত্তর না থাকলেও, জানায় সবটা জানিয়েই সে বড় করবে তার মোমোকে। এই এতো বড়ো সিদ্ধান্ত কখনোই তার একার পক্ষে নেওয়া সম্ভব না হলেও অসম্ভবও নয়। স্পষ্টত জানিয়ে দেয় মোমোকে তার অসহায় গর্ভধারিনী ছেড়ে গেলেও সে এক সন্তানের মা হয়ে আর এক সন্তানকে কখনই অজানা অন্ধকারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিতে পারবে না। দিব্যর যথাযথ প্রশ্নগুলি নন্দিনীর মনে কাঁটার মতো বিঁধলেও তার জেদ, অপত্য স্নেহ ও মাতৃত্বের যৌক্তিকতার কাছে তারা মাথা নোয়ায়।

|| ৬ ||

এভাবেই বেশ কিছুদিন পারও হয়ে যায়। এদিকে সব কিছুর মধ্যে তাদের ছেলে অভ্র কিন্তু কিছুতেই তার বাবা মা ও তার মাঝে মোমো র উপস্থিতি স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারে না। মোমোর মুখের নতুন শব্দ ''মাম্মা-মাম্মা, বাব্বা-বাব্বা'' বাড়িতে নতুন আবহের সৃষ্টি করে। বাড়িতে সবসময় একটা শিশুর উপস্থিতি, কান্না হাসি, আলোচনা সব মিলিয়ে দিব্যকেও অচেনা ভালোবাসার বাহুডোরে বেঁধে ফেলে। অবশেষে দিব্য দত্তক নিতে রাজিও হয়ে যায়। ভারতীয় দত্তক আইনানুসারে সকল নিয়মাবলী ও শর্তানুযায়ী মোমোকে তারা সন্তান হিসাবে গ্রহণ করে। তবে তাদের ছেলেকে সবটা জানালেও সব কিছুতে ''উড়ে এসে জুড়ে বসা'' বোনের সমান অধিকার এবং পাকাপাকি ভাবে দওক নেওয়া বিষয়টা ছেলের পক্ষে মেনে নেওয়াটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। অভ্র কলেজের ছুটিতে আসা বন্ধ করে দেয়। প্রদেশের দূরত্বের সাথে সাথে মনের দূরত্বও বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দেয়। প্রথমে নানান অজুহাত দিলেও দিব্য ছেলের সাথে কথা বলে জানতে পারে তার বাড়ি আসতে ভালো লাগে না। যেটা নিজের বাড়ি ছিল অভ্রর কাছে সেটা মায়ের কৃপায় নাকি ''হোম'' এ পরিণত হয়েছে। সব অবস্থার জন্যই সে তার মাকে দায়ী করে। দেখতে দেখতে অভ্রর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি হাতে আসে। ঠিক হয় উচ্চশিক্ষার জন্য অভ্র তার মামার তদারকিতে বিদেশে পড়তে যাবে। যাওয়ার সবকিছু ঠিক হলে অভ্র যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

মোমো বিষয়ে নন্দিনী ও দিব্যর সমীকরণ মিলে গেলেও তার ছেলে অভ্রর ব্যবহার শুধু নন্দিনী নয় দিব্যকেও অবাক করে, জানা অঙ্কে অজানা ভুলের ন্যায়। এতটা পরিবর্তন তারা আশা করেনি।

|| ৭ ||

নন্দিনী জীবনের ঝোড়ো আবহাওয়া চলাকালীন শ্রীময়ীর বিয়ে হয়ে যায়। শ্রীময়ী নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হওয়ার সাথেই নিজের জীবনের অবিন্যস্ত অধ্যায় গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

স্বামীর আমেদাবাদ বদলিতে সেও সাথে যায়। নতুন শহর নতুন জীবনের রোমাঞ্চ উদ্ঘাটনে বেশ কিছুটা সময়ও যায়। নতুন মাটিতে শিকড়, শাখা প্রশাখা বিস্তারের মুহূর্তে শ্রীময়ীর কলকাতায় যাতায়াত ধীরে ধীরে কমতে থাকে। প্রথম প্রথম পুজোর আশেপাশে কলকাতা যাওয়া হলেও নিজে একটি চাকরি পাওয়ার পর আর বিশেষ যাওয়া হয়না বললেই চলে। চেনা শহরের অলিগলি, ভিড়ের কোলাহল সবটাই অচেনার ভাষায় অচেনা ভিড়ে হারিয়ে যেতে শুরু করে। মাঝে মধ্যে চিঠি বা ফোনে প্রিয়জনের খবরাখবর আসতো বটে, তাই দিয়ে বাকি সময়টা অদ্ভুত ভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে কাটিয়ে দিতে শুরু করে। প্রত্যেকের জীবনই চলতে থাকে তার নিজস্ব গতিবিধি ও সময়ের ধারাবাহিকতায়। এসবেই বেশ খানিকটা সময়ও পার হয়। হঠাৎই একদিন একটি পার্সেল ও একটি চিঠি এসে পৌঁছায়। সামনেই জন্মদিন তাই হয়তো কোনো উপহার এসেছে। বাক্সটি টেবিলের উপর রেখে চিঠিটি খোলে। নন্দিনীর চিঠি। আনন্দে আবেগে চিঠি খুললেও পড়ার পর বিষন্নতার মেঘ ঘনিয়ে আসে। নন্দিনীর সুদীর্ঘ চিঠির সারাংশ হিসাবে উদ্ধার করে যে অভ্র হঠাৎই বিয়ে করেছে,বয়সে বেশ বড়ো পেশায় এক ফটোগ্রাফারকে। মা হিসাবে এক সন্তানকে আগলাতে গিয়ে আর এক সন্তান কবে কি ভাবে এতো দূর হয়ে গেল সত্যিই বুঝতে পারেনি নন্দিনী। হাতের পাঁচটা আঙুলের যে কোনো একটি কেটে গেলে বা ক্ষত সৃষ্টি হলে যে সমান ব্যথা অনুভূত হয়, মা যে তার সব সন্তানের কষ্টেই সমান যন্ত্রণা অনুভব করেন তা হয়তো কোন সন্তানই তেমন ভাবে বোঝেনা। সন্তান দূরে গেলেও মা বাবা সন্তান না দেখে বা দূরে বেশী দিন থাকতে পারে না। নন্দিনী ও দিব্য তাই ঠিক করেছে অভ্রর কাছে যাবে ইংল্যান্ডে, যাতে দূরত্ব কিছুটা হলেও কম করা সম্ভব হয়। এতোদিন পরে অবশ্য ছেলে খবরটি শুনে খুশিই হয়েছে। তার পরিবারকে ও ছেলে অভ্রকে তার বাবা মার আরো একবার কাছে পাওয়ার তাগিদকে স্বাগত জানায়। তাই কলকাতার ব্যবসার সমস্ত শেয়ার বিক্রি করে ওদেরই পার্টনার কোম্পানীর হেড অফিস ম্যাঞ্চেস্টার এ যোগ দিয়েছে দিব্য। এই এতো কিছু এক কথায় শেষ হয়ে গেলেও তাদের জন্য এটা মোটেও সহজ ছিল না। আগামী মাসে ২৫ তারিখ নন্দিনী, দিব্যর ও মোমো চলে যাবে ম্যাঞ্চেস্টার। সব ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে, এবারে ওরা সত্যি সত্যিই যাবে, তারা মানে দিব্যর সাথে নন্দিনী ও মোমোও। শ্রীময়ী লক্ষ্য করে চিঠিটির তারিখের দিকে। ডাক বিভাগের গোলযোগে চিঠিটি পৌঁছালেও তারিখটি প্রায় মাস দুয়েক আগের।

একসাথে এতো খবরের বোঝা সামলে উঠলেও শ্রীময়ী জানতো না যে চিঠির ''ইতি নন্দিনী'' কথাটি যে সত্যিই নন্দিনী অধ্যায়ের ইতি টানতে চলেছে। যোগাযোগের অপারগতা বা বিচ্ছিন্নতায় দুই বন্ধুর বন্ধুত্ব এক অসমাপ্ত গল্প হয়েই থেকে যায়। বাকিটা ভবিষ্যতের কাছে একাধিক প্রশ্ন হয়ে থেকে যায় আর তার উত্তরসূরী হিসাবে জন্ম নেয় ''হয়তো'' শব্দটি। হয়তো সেদিনের স্বপ্ন-উড়ান নন্দিনীকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে হয়তো নন্দিনী ভালোবাসার বাঁধনে পরিবারকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছে। হয়তো তার সন্তানদের মতো আমাদের সমাজও নন্দিনীর আধুনিকতার উদারতার যথাযথ ও যোগ্য সম্মান দিতে পেরেছে। হয়তো মোমো এবং তার দাদা অভ্র একসাথেই উপযুক্ত সন্তান হিসাবে ভাগ করে নিয়েছে ভালোবাসার উত্তরাধিকার।

পরিচয়

পল্লব ভট্টাচার্য্য

বিকেল ঠিক পাঁচটায় কবিগুরু এক্সপ্রেস দুমকাতে এসে দাঁড়াল। ট্রেন থেকে সুট বুট পরে এক ভদ্রলোক নামলেন। সিধু কানু মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে – সেই উপলক্ষে দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে আজ দুমকাতে ফিরে এলেন ঐ ভদ্রলোক। কিন্তু এটা তো হল এখনকার কথা…

সানি আর ভিশির বন্ধুত্ব যে ঠিক কি করে হয়েছিল তা নিয়ে অনেক গুজব আছে; শোনা যায় এক্কেবারে পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকেই ওদের বন্ধুত্ব। আর সনাতন মুর্মু যে কি করে সানি হল আর বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলি যে কি করে ভিশি হল তা নিয়েও মতভেদ আছে। মজার ব্যাপার হল, সানি আর ভিশি কোনদিন এই প্রশ্নের উত্তর দিতেও চায়নি। ওদের জিজ্ঞেস করলে হেসে বলত "সানি আর ভিশির বন্ধুত্ব না হলে ভারতের ক্রিকেট দলের কি হাল হত একটু ভেবে দেখেছেন?"

দুই বন্ধু এক সঙ্গে কী না করেছে? স্কুল কেটে অমিতাভ বচ্চনের সিনেমা দেখা, এক সঙ্গে বিড়িতে সুখটান দেওয়া, ফুটবল দেখতে যাওয়া -- সব কিছু। শোনা যায় এক সঙ্গে বেশ কিছু অপকর্মও করত এই দুজন, কিন্তু সে সব অন্য কোন সময়ে আলোচনা করা যাবে। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা বলা হয়নি, ক্লাস নাইন থেকে ওরা একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত; ওরা ছিল ঐ যাকে বলে একে অপরের "বেস্ট ফ্রেন্ড"…

স্টেশনের একটা স্টল থেকে এক কাপ চা কিনলেন ঐ পদার্থবিদ ভদ্রলোক। চায়ে চুমুক দিতে মনটা আবার চলে গেল সেই ফেলে আসা দিনগুলোতে। তখন ক্লাস সেভেন। স্কুলের ঠিক পাশে ছিল পুণ্য মালীর স্টল। সেখান থেকে বিড়ি কিনে লুকিয়ে দুই বন্ধু রাস্তার মোড়ে যে কালভার্ট ছিল, তার আড়ালে লুকিয়ে বিড়িতে টান দিচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে সেখানে চলে আসেন ইতিহাসের শিক্ষিকা যূথিকা দত্ত। খুব বকুনি খেয়েছিল দুজন। তারপর ভিশিকে একটু আড়ালে ডেকে বলেন "তুই ঐ মুর্মুর থেকে দূরে দূরে থাকবি। ওরা তো কত কিছুই করে থাকে, তাই বলে সে সব তো আমরা করতে পারি না, তাই না? এর পর দেখবি কবে হাঁড়িয়া খাওয়াবে তোকে"। ভিশি ঠিক বুঝতে পারেনি ঐ কথার মানে। ও সানিকে জিজ্ঞেস করেছিল যে ওরা বাড়িতে কি কি খায়। গম্ভীর মুখ করে সানি সেদিন চলে গিয়েছিল। ক্লাস টেন তখন। দুজনেই পড়াশোনাতে ভালই করে ক্লাসে। ভিশি সানিকে বলে রবিবার ওদের বাড়িতে আসতে। সানি একটু ঘাবড়ে বলে "না রে, তোদের পাড়ায় আমি যাব না। তুই কি দেখতে পাস না, তোদের পাড়ায় সবাই আমার দিকে কেমন করে তাকায়? আমার ভাল লাগে না"। ভিশি মানতে চায় নি সে কথা। ও বাড়ি গিয়ে ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করে সানি আসলে ওর বাবা মার কোন অসুবিধে আছে কি না। অল ইন্ডিয়া রেডিওর খবরটা বন্ধ করে ওর বাবা বলেন "দেখ বিশু, আমরা অনেক পুরুষ ধরে দুমকায় আছি। আমাদের সব প্রফেশনাল বাঙালিদের একটা সুনাম আছে। এখন তো আর আগের মত নয়। সাঁওতালরা শুনেছি আগে এই পাড়ায় তেমন আসত না। তা সানি যদি আসতে চায় তাহলে আসবে। তবে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে বোর্ডের পরীক্ষায় ভাল ফল না করলে ওর কিছু এসে যাবে না, কিন্তু তোমার তো তা না! তোমাকে তো ভাল ফল করতেই হবে! তোমার যে রক্তে পড়াশুনো আছে বাবা!" ভিশি ঠিক বুঝতে পারেনি কেন ওকে পরীক্ষায় ভাল করতেই হবে কিন্তু সানিকে নয়। সানি সেই রবিবার ওদের বাড়িতে আসেনি…

চায়ের খুড়িটা রেললাইনে ছুঁড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক। সেই রবিবার কেন, আর কোনদিনই সানি ভিশিদের বাড়িতে আসেনি। তবে ওদের বন্ধুত্ব কিন্তু এক বিন্দুও কমেনি। স্কুলে স্পোর্টস হবে আর কয়েকদিন পরে। ভিশি আর সানি কেউই স্পোর্টসে নাম দেয়নি। আসলে ঐদিন সানির জন্মদিন, তাই ভিশি সেদিন সানির বাড়িতে নিমন্ত্রিত। খেলার শিক্ষক বিরাট কুরলির তো মাথায় হাত! বললেন "ওরে সনাতন, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুই সাঁওতালের ছেলে হয়ে স্পোর্টসে নাম দিস নি? বিশ্বেশ্বরের না হয় অন্য ব্যাপার, কিন্তু তোর কি স্পোর্টস না করলে চলবে?" সানির জন্মদিনেই গিয়েছিল ভিশি। ওর মা ওর সঙ্গে সানির জন্যে একটা সোয়েটার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খুব হই হুল্লোড় করে ফেরার সময়ে সানির বাবা ভিশিকে ডেকে একটা বই দিয়ে বলেন "এই বইটা পারলে পড়ো"। বইটার নাম "On the Origin of Species"। ভিশি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে "আপনি স্পোর্টসম্যান চাচাজী?" সানির বাবা হো হো করে হেসে বলেন "আমি আর স্পোর্টস? সারাজীবন শুধু বই পড়েছি বেটা বিশু"…

একটা রিকশা নিতে হবে ভদ্রলোককে। তার আগে স্টল থেকে একটা খবরের কাগজ কেনার জন্যে পা বাড়ালেন ভদ্রলোক। তখন ক্লাস টুয়েলভ। অমিতাভ বচ্চনের "অগ্নিপথ" রিলিজ করেছে। আর দেখতে আছে? দুই বন্ধু চলল সিনেমা দেখতে। ক্লাস ফাঁকি না দিয়ে, বাড়িতে বলে এই প্রথম মনে হয় ওরা চলল সিনেমা দেখতে। অমিতাভের সঙ্গে মিঠুন, এ তো ডবল বোনাস! আকাশটা একটু মেঘলা হয়ে আসছে। টিকিটের লাইনে দাঁড়াতে যাবে আর তখনি গায়ে পড়ল পুলিশের লাঠির ঘা! "এই তোরা টিকিট ব্ল্যাক করছিস?" "কই না তো? আমরা তো সিনেমা দেখতে এসেছি"। "মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে?" "না সত্যি বলছি। এই যে আমাদের স্কুলের আইডি কার্ড"। সানির বাবার উপদেশে দুই বন্ধু সেদিন সঙ্গে আইডি কার্ড সঙ্গে রেখেছিল। "ঠিক আছে, এবারের মত ছেড়ে দিচ্ছি, পরের বার কিন্তু এত সহজে ছাড়ব না"। তারপর পুলিশ ভিশিকে বলে "সাবধান করে দিলাম। তোকে মারলে তো তুই বাঁচবি না। তোর বন্ধুর চামড়া মোটা আছে, ওকে অনেক পেটালেও কিছু হবে না, ও সাঁওতালের বাচ্চা আছে"। সেদিন ওরা আর সিনেমা দেখেনি। ফেরার পথে সানি বলে "দেখ, তুই তো হবি প্রফেসর। আমি কি হব কে জানে? আমার সঙ্গে তোর ঘোরাফেরা ঠিক নয়"। সানি সেইদিনের পর থেকে আর ভিশির সঙ্গে কথা বলেনি। ভিশি অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু সানি কোন সাড়া দেয়নি। স্কুল পাশ করার পরে দুই বন্ধুর আর কোন যোগাযোগও থাকেনি।

স্টল থেকে খবরের কাগজ নিয়ে প্রথম পাতাতেই একটা খবর চোখে পড়ল। আমেরিকাতে কোন এক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি পুলিশের অত্যাচারে মারা গিয়েছে। শরীরের ভিতরটা কেমন যেন একটা করে উঠল। মনে হল মাথাটা যেন একটু

ঘুরলো। ডায়াবেটিক ঐ ভদ্রলোক পকেট থেকে দুটো লজেন্স বের করে মুখে পুরলেন। রুমাল দিয়ে চশমাটা মুছে খবরের কাগজটা অ্যাটাচিতে ঢুকিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি। একটা অদ্ভুত অনুভূতি নেমে এল যেটা ঠিক বলে বোঝানো যায় না। হঠাৎ স্মার্টফোনটা বের করে তাতে "বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলি"-কে খুঁজতে লাগলেন ভদ্রলোক। সুট বুট খুলে অনেকদিন পরে নিজের সাদামাটা পোশাক পরে কাল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যাবেন বলে ঠিক করলেন বিশ্ব বিখ্যাত পদার্থবিদ অধ্যাপক সনাতন মুর্মু।

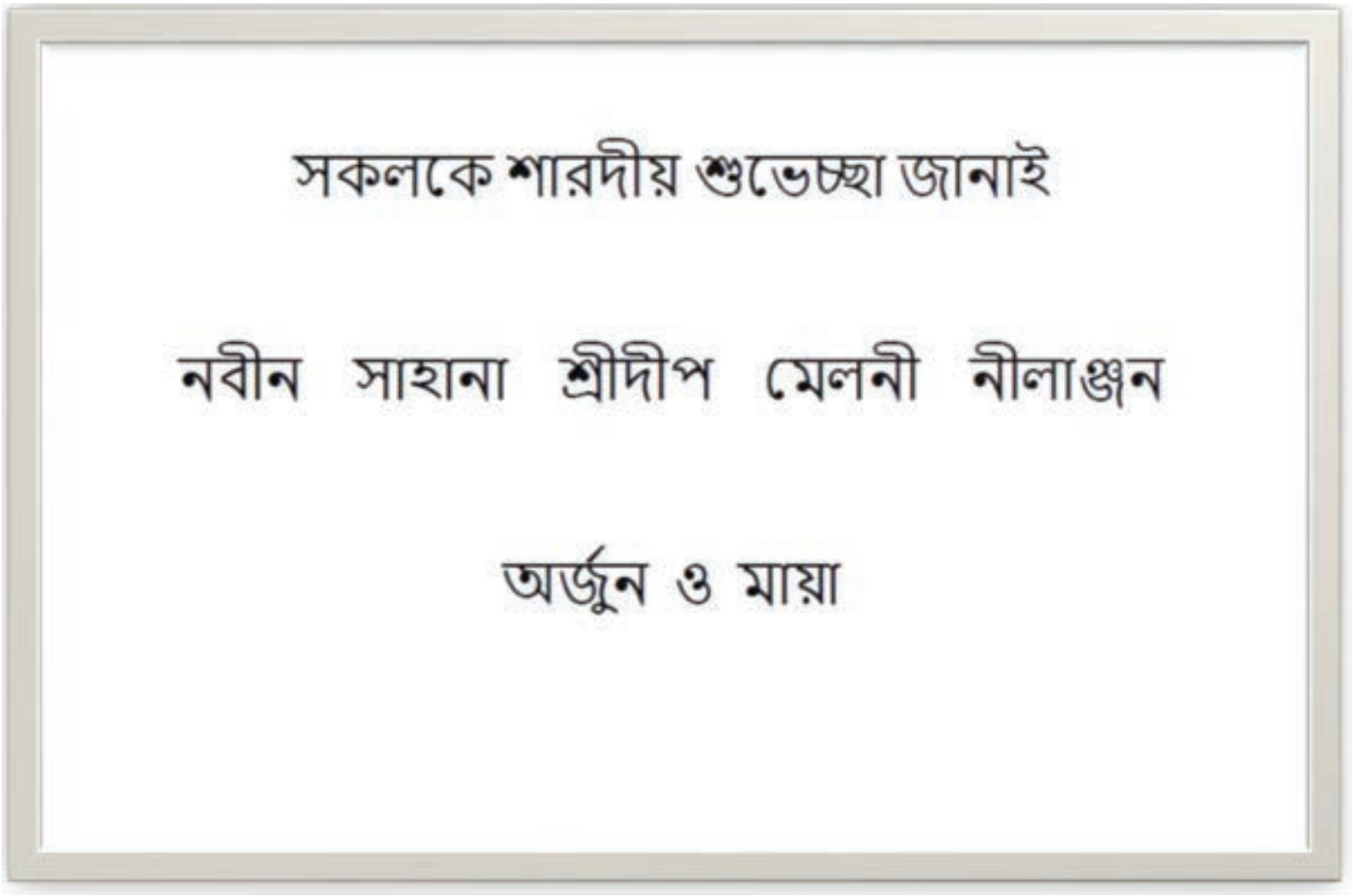

দৈবের বশে, প্রবাসে

নবীন নাগ

১৯৭৬ সালের জানুয়ারির শেষে আমরা দেশ ছেড়ে প্রথম বার বিদেশে যাই। গন্তব্যস্থল হল্যান্ড। ওখানকার Twente University of Technology (THT) তে একটি পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ নিয়ে এক বছরের জন্য যাওয়া। কে জানতো সেই এক বছর ৪৪ বছরে (মাঝে ২ বছর বাদ) পরিণত হবে! এই ৪২ বছরের ৪০ বছর কেটেছে আমেরিকায় এবং ১ বছর করে হল্যান্ড ও পশ্চিম বার্লিনে। এই লেখায়, আমার এই হল্যান্ড ও জার্মানিতে থাকার কিছু বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা জানা যাবে।

১৯৭৬ সালের ১৯ শে জানুয়ারি হাওড়া থেকে ডিলাক্স এক্সপ্রেস এ দিল্লী পৌঁছে পরের দিন একটা চার্টার্ড ফ্লাইট এ হল্যান্ড যাওয়ার কথা। মা ভাই দের ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন দের চোখের জলে বিদায় এর পর ট্রেনে চাপলাম আমি সাহানা ও বাবু। পরের দিন সকালে দিল্লী পৌঁছে ঠিক করা গেল যে, সঙ্গে যা ভারতীয় মুদ্রা ছিল তা শেষ করে প্লেন এ চাপবো। এই জন্য একটি দামি হোটেলে রাত কাটিয়ে শখ মেটানোর সুযোগ নেওয়া যাবে ভাবলাম। তখনকার দিনে আজকের মতো অত বড় বড় বিদেশী ও দেশী হোটেল ছিল না। আমি অশোক হোটেলের নাম জানতাম এবং সেখানে এক রাত থাকার সুযোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। এই উদ্দেশে বাইরে ট্যাক্সি ধরতে গেলাম। এক সর্দারজির গাড়ি পাওয়া গেল। উনি জিজ্ঞাসা করলেন "কাহা জায়েঙ্গে"? আমি যেই বলেছি অশোক হোটেল উনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললেন "বাপরে"। আমাদের মতো ছাপোষা বাঙালির সাহস দেখে উনি অবাক হয়েছিলেন বোঝা গেল। কিন্তু উনি তো জানতেন না যে আমাকে ভারতীয় মুদ্রার ভার থেকে মুক্তি পেতে হবে!

আমরা খুবই ভাগ্যবান ছিলাম যে আমাদের প্রথম বিদেশ বাস হল্যান্ডে হয়েছিল। তার কারণ ঐ দেশে আমরা ডাচদের থেকে যা সাহায্য, সহানুভূতি ও আতিথেয়তা পেয়েছিলাম তার কোনো তুলনা নেই। এর দু' একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

প্রথমে হল্যান্ডের ট্যাক্সি অভিজ্ঞতা। তখনকার সব ট্যাক্সিই (অন্তত তখন) ছিল Mercedes. আমস্টারডাম থেকে ট্রেনে হেঙ্গেলো বলে একটা শহরে নেমে ট্যাক্সিতে আমাদের THT ক্যাম্পাসে (যেটা Enschede শহরের অংশ, তবে দূরে ছিল) যেতে হত। ক্যাম্পাস এর মধ্যেই গেস্ট হাউস এ অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক করা ছিল। যখন ক্যাম্পাসের গেটে পৌঁছলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ট্যাক্সি চালক গেট থেকে অ্যাপার্টমেন্টের চাবি সংগ্রহ করে আমাদের নিয়ে গেলো থাকার অ্যাপার্টমেন্টে। ওখানে গাড়ি থামিয়ে ঝড়ের বেগে সুটকেস দুটো নিয়ে (না অনুরোধ সত্ত্বেও) অ্যাপার্টমেন্টের চাবি খুলে আমাদের ওখানে ঢুকিয়ে দিয়ে ভাড়া নিয়ে "হ্যাভ এ গুড নাইট" বলে আবার ঝড়ের বেগে চলে গেলো ট্যাক্সি চালক। আমাদের দেশের ট্যাক্সি চালক দের কথা মনে পড়ে ছিল।
মনে আছে রাতে কিছু খাবার না জোটায় দেশ থেকে আনা আপেল খেয়ে রাত কাটিয়েছিলাম।

পরের দিন সকালে ডিপার্টমেন্টে যাবার রাস্তা না জেনে বাইরে বেরিয়ে একটা গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসা করলাম কি ভাবে যাবো। উনি বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিলেন। আমার গন্তব্যস্থান কিন্তু ওনার গন্তব্যস্থানের সম্পূর্ণ অন্যদিকে ছিল। এটাই আসল পরোপকারিতার পরিচয়।

কাজের প্রথমদিনের সকালটা ছিল দুর্যোগ পূর্ণ বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া, টিপিকাল ডাচ ওয়েদার! যাই হোক ডিপার্টমেন্টে পৌঁছে প্রফেসর মার্স (আমাদের মেন্টর) এর সাথে দেখা করার সঙ্গে সঙ্গে উনি আমাদের একটা অন্য লোকের বর্ষাতি পরিয়ে নিয়ে গেলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিভাগে। উনি গাড়ি চালাতেন না, কাজেই আমাদের এই দুর্যোগের মধ্যে হেঁটেই যেতে হল। ওখানে গিয়ে আমাদের হেলথ ইন্সুরেন্স এর ব্যবস্থা করে কিছু টাকা অগ্রিম করিয়ে দিয়ে সোজা ক্যাম্পাসের একটি গ্রসারি স্টোরে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কিনে চললেন আমার বাড়িতে। উনি একটা ব্যাগ নিজের ঘাড়ে নিয়ে আর আমাকে একটা দিয়ে চললেন। বৃষ্টি ও হাওয়া তখনও অব্যাহত।

আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট ছিল ক্যাম্পাসের মধ্যে একটা জঙ্গলে। শহরের নাম Enschede. ওখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে কাজের জায়গায় গেলাম। Enschede তে যাওয়ার এক সপ্তাহ পর প্রথম বরফপাত দেখলাম এবং প্রথম উইকেন্ডে গেলাম Enschede শহরে। ওখানে যাওয়ার জন্য প্রায় কুড়ি মিনিট হেঁটে বাস ধরতে হল। শহরে দুই এক ঘন্টা কাটিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য বাস স্ট্যান্ডে গেলাম। এদিকে তখন ঝুপ করে অন্ধকার নেমে গেছে। বরফের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা গুলো অবশ হয়ে যাওয়ার জোগাড়, কিন্তুবাসের দেখা নাই। এভাবে প্রায় একঘন্টা শাস্তিভোগ করার পর ভগবান এক দেবদূতকে গাড়ি নিয়ে পাঠালেন। এক ভদ্রলোক আমাদের ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝলেন যে আমরা বিপদে পড়েছি। উনি আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য (সম্পূর্ণ উপযাচক হয়ে) গাড়িতে সকলকে বসালেন। তারপর সোজা ক্যাম্পাসে নিয়ে গেলেন। এইরকম পরোপকারিতা কেবল মাত্র ডাচদের মধ্যেই দেখেছি। এছাড়া আমার গাড়ি না থাকায় আমার সহকর্মীরা (ছাত্র ও শিক্ষক) কতবার যে গাড়িতে করে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেছেন তার সংখ্যা নেই। ওই আবাসনের এক ডাচ ভদ্রমহিলা আমার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করা থেকে তাকে প্রতিদিন সেখানে নিজের ছেলেমেয়ে দের সঙ্গে যাতায়াতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়।

আর একবার আমি আমস্টারডাম থেকে অন্য একটা শহরে যাবার জন্য মেট্রো স্টেশনে টিকিট কাটার অফিস খুঁজে না পেয়ে একটা ভদ্রলোক কে জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় টিকিট কাটবো। উনি হলটিং ইংলিশে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। (ডাচেরা ভালো ইংলিশ জানে কিন্তু বলার সময় ঠিক ফ্লুয়েন্ট ছিল না)। তারপর আমার হাত ধরে (literally) নিয়ে গিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে টিকিট কেটে আমার হাতে দিয়ে "হ্যাভ এ গুড ডে" বলে চলে গেলেন। এরকম অযাচিতভাবে লোকের (বিশেষত সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশীর) উপকার করার নিদর্শন আমি এই দীর্ঘ প্রবাস জীবনে কোথাও আর পাই নি।

হল্যান্ড সম্বন্ধে একটা নালিশ। ওখানে তখনকার দিনে প্রায় ৫০০ ডলার খরচ করে গাড়ি চালানোর শিক্ষা নিয়ে দু'বার ফেল করে ওই অ্যাডভেঞ্চার শেষ করতে হয়। শুনেছিলাম ওখানে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া ভীষণ শক্ত। এ কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম।

হল্যান্ড থেকে এ দেশে এসে ইউনিভার্সিটি অফ ডেলাওয়্যার যাই এবং সাড়ে চার বছর কাটানোর পর যাই বার্লিন এর Fritz Haber Institute (FHI) এ একবছরের জন্য। দেশে ফিরে যাবার আগে জার্মানি দেখার উদ্দেশ্য প্রধান ছিল। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে বার্লিন (ওয়েস্ট বার্লিন, তখনও বার্লিন ওয়াল বিদ্যমান!) যাই। সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা পরে জার্মানির প্রতি আমার একটা প্রচন্ড কৌতূহল জন্মেছিল। মূলত সেই জন্য যাওয়া। দুঃখের বিষয় বার্লিন তথা জার্মানিতে থাকার অভিজ্ঞতা হল্যান্ড এর মতো মধুর হয়নি, বরং তিক্ততায় ভরা ছিল।

আমরা বার্লিনে পৌঁছোবার আগেই আমার ইনস্টিটিউট (FHI) আমাদের জন্য একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক করে রেখেছিল। তিনতলা বাড়ির একতলায় আমরা আর বাড়িওয়ালা ওপর তলায়। দুঃখের বিষয় বাড়ির মালিক ও তার স্ত্রী আমাদের পছন্দ করতো না কারণ আমরা বিদেশী - বিশেষত ভারতীয়। কোনো রকম সাহায্য করা তো দূর, আমাদের অবর্তমানে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতো এবং সামান্য কারণে অফিস এ নালিশ জানাত। এমনকি আমার দেড় বছরের ছোট ছেলে শরীর খারাপের জন্য রাত্রে কাঁদলেও পরের দিন সকালে অফিসে যেয়ে নালিশ শুনতে হত।

আমি আমার বসের কাছে আপত্তি জানালে বলতো যে বার্লিনে হাউসিং ক্রাইসিস আছে সেজন্য বাড়ির মালিকদের বিরাট লবি থাকার জন্য তাদের এত প্রতাপ। নট এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড অফ সিম্প্যাথি! একবার আমার গাড়িটা রাস্তার পাশে পার্ক করেছি এমন সময় সামনের বাড়ির এক বুড়ি দেখি আমাকে গালাগালি করছে কারণ আমি তার বাড়ির সামনে গাড়ি রেখেছি। অথচ ঐখানে পার্কিং করা সম্পূর্ণ লিগাল ছিল। ভাগ্যিস জার্মান ভাষাটা ভালো জানতাম না, তাই গালাগালি টা ওনার বৃথাই হল!

আর একবার সিটি সেন্টারের দোতলা একটা গ্যারেজ এ গাড়ি রাখতে যেয়ে অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা হলো। পাশাপাশি দুটো ramp, আমি উপরে উঠতে উঠতে আমার ramp টা ঠিক কিনা জানার জন্য পাশের ramp দিয়ে উঠতে থাকা একজন ড্রাইভার এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জানলাটা খুলে মুখ বারবার সঙ্গে সঙ্গে ওই চালক প্রচন্ড জোরের সঙ্গে "nein, nein, nein" বলে উপরে উঠে গেল। মর্মার্থ হলো ও কোনো কথা শুনতে চায় না। অভদ্রতার চূড়ান্ত। (পাশাপাশি হল্যান্ডের অভিজ্ঞতা গুলো স্মরণ করুন!)

আর একবার বাস ধরার জন্য শীতে কাঁপতে কাঁপতে স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছি আমরা চারটি প্রাণী। পাশেই ছিলেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলা আমরা কোথাকার লোক জানার জন্য ভদ্রলোককে বোধহয় প্রশ্ন করছিলেন। ভদ্রলোক বোঝাবার চেষ্টা করতে ব্যর্থ হয়ে হাতের ইঙ্গিতে ভাত খাবার ভঙ্গি করেন। বললেন "ous Indien kein essen " অর্থাৎ এরা ভারতের লোক যেখানে খাবার পাওয়া যায়না বা যারা খেতে পায় না। আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অথচ এই বার্লিন এ এক বৃদ্ধা ভিখারীকে রাস্তায় ভিক্ষা করতে দেখে (রেয়ার ইভেন্ট!) কিছু পয়সা দিয়েছিলাম এবং বাড়ি ফিরে সাহানাকে এই ঘটনা বলেছিলাম। ওদেশেও তখন ভিখারী ছিল। আমি প্রকাশ্যে বাস চালক ও এক যাত্রীকে রাস্তায় নেমে ঝগড়া করতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। বাস চালক ঝগড়া শেষ করে বাস এ উঠে বাস চালিয়ে সকলকে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছিল। সত্যিই অবিশ্বাস্য!

আর একটি ঘটনা দিয়ে এই স্মৃতি চারণ শেষ করছি। এটির রস সম্পূর্ণ অন্যরকম। ১৯৮০ সালের শেষের দিকে আমার ইনস্টিটিউট থেকে (খ্রিস্টমাস উপলক্ষে) একটি ডিনার এ আমাদের ডেকেছিল। ওখানের একজন প্রফেসর এর স্ত্রীর পাশে আমি বসে কথা বলছিলাম। উনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের মানুষ। যুদ্ধের পর উনি রাশিয়ান যুদ্ধজয়ী সৈন্যদের কথা বলছিলেন। উনি রাশিয়ানদের অত্যাচারের কথা বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন আমার কাছে। বিদেশীরা আমাদের মতো প্রকাশ্যে শোক প্রকাশ করে ভেঙে পরে না বলেই আমি ওনার আঘাতের ক্ষমতার কথা বুঝতে পেরেছিলাম। জার্মানরা holocaust ঘটিয়েছিল আর তারপর রাশিয়ানরা সুযোগ পেয়ে নিরীহ জার্মানদের উপর অকথ্য ও পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিল। (Dickens এর কথায় "...new oppressors who have risen on the destruction of the old ")

আমি এই ঘটনাগুলি দিয়ে একটা জাতের সম্বন্ধে কোন ভ্যালু জাজমেন্ট দিতে চাই নি। আমার উদ্দেশ্য নিজের অভিজ্ঞতা গুলো যা এখনো আমার মনে জাগ্রত আছে অমলিন আছে তা শেয়ার করা। প্রমথনাথ বিশীর কথায় বলতে হয় "আশ্চর্য এই জীবন। আশ্চর্য এই পৃথিবী।" চোখ কান খোলা থাকলে আমরা প্রতি মুহূর্তে অভিনব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। তাই জীবন আশ্চর্য। তাই এই পৃথিবী আশ্চর্য।

Pandemic

Taniya Talukdar

A pandemic, a few hobbies, and a lot of social media

Not sure if it was a man who ate a bat in a remote village in Wuhan or someone running experiments in a lab that triggered the spread of Coronavirus - but this was China's gift to the world. Declared a pandemic by the World Health Organization (WHO), it lay siege and paralyzed normal life across the world!

This is the first time most of us experienced a pandemic. Lockdown forced us to retreat to our houses and stay in to be safe. With social distancing being the norm and lack of an active social life and entertainment, many of us were forced to try new things - like hobbies (pun intended).

Things here in Cleveland were no different among the Bengali community. Some answered their inner calling, while others - if we may say - followed the herd. Social media, of course, played a pivotal role in broadcasting these talents to the world.

I have never known so many painters, err...artists, in all the years that I have walked the earth, and believe me, I have quite a few to my credit. All sorts of artworks were splashed across my timeline, which made it hard to ignore. How can everyone paint so well while I can barely mix colors, I thought to myself? Then I too tried my hands at it, and all I could come up with was a few colorful flowers. My husband was very encouraging - you paint very well, said the poor man who needs his wife in a good mood to get a good meal.

Bengalis cannot be kept away from gardening. You should see the social media posts that show up during summer if you are friends with too many Bengalis. With the lockdown, many started investing more time in this particular activity. I also made up my mind to try my hands at growing some vegetables. Spent a fortune getting pots, potting soil, plants, plant food, and all the ammo and ended up feeding plant food to the plants every day in large amounts in a bid to make them grow fast and bear fruit but alas, I couldn't even redeem 10% of the whole investment. Other gardeners kept posting their harvest pictures on social media of exotic berries, bell peppers, eggplants, tomatoes - in all colors, shapes and sizes. I successfully bullied some of them into sharing their reap with me.

Zoom found a very special place in everyone's life during the lockdown. It became a new tool to catch up with families and friends across the world. But more importantly it helped connect neighbors across the street. Screenshots from every zoom meeting would find its way to social media.

Many found their passion in the kitchen during these unprecedented times. Some freshers with no prior experience were seen dishing out one exotic fare after another. It felt like they'd finally found their true calling. Food is an emotion for us Bengalis, and posts about food became a regular feature.

Binge-watching was at an all-time high. Streaming services like Netflix and Amazon became the next best friend. Recommendations of good shows were shared on social media and that's something I really appreciated. In fact, one of the best web series that I have seen so far, Dark, was the outcome of one such referral.

While chat shows were the new thing for many world over, closer home in Cleveland, people started their own YouTube Lifestyle channel. Whether recipe for an exotic dish or the tour of a park or berry picking, the content has been rather creative and diverse. People were seen connecting more with nature and exploring parks far and near with their families. They found creative outlets for their pent-up energy and various ways to entertain themselves.

However, the active social life is missed by many as saris keep piling up in the wardrobe patiently waiting for their turn to be taken out for an evening with friends. Many miss investing their time to match their saris with jewelry, shoes and purses while others miss the opportunity to criticize the remaining for not dressing up enough! And, this time, they'll have to match their masks too. All in all, the ladies of the community are sad for not being able to play dress up this Durga Puja

Time might throw up some more trends at us during this pandemic however, we can only hope that our normal social life eventually makes a comeback. Now that's a trend I look forward to...

Stopping Hitler and the Autumn of 1943

Rajanya Bishi

Chapter 1: The Beginning

It was August 2, 1943. I rushed down the stairs and flung open the door. As I stepped on the soft, damp concrete I looked at the sky. The clouds were dancing, and the wind was howling in rage. This reminded me of my parents, my beloved parents, who had been captured by Hitler. Tears came into my eyes and were rolling down like a stream flowing by, but I immediately wiped them away before anyone could notice. Before my mum and dad had left, dad had taught me something, "Wherever you are in life Audrie, crying won't get anyone anywhere." I stood up tall and put on a determined face.

"Whatever it takes, whatever it costs I will get them back, but I had just one question and that was could I, just a fifteen-year-old girl stop Hitler?"

I went back inside and had breakfast. As I was clearing away the table my eyes caught something. It was a note. I clumsy picked it up and read it. In mum's best handwriting:

Dear Audrie,

As you know your father and I have been captured by Hitler and the Nazis. The only thing I want you to do is to take care of the house and not worry about us. I must inform you that there is something I want you to know about. In the house, you will find a secret library. I want you to explore it and maybe even find a way to help us. That is all I can tell you. Remember one thing though... you will NEVER be alone. Good Luck and remember that we will always be there for you.

Yours loving,
Mum

Chapter 2: The woman in the picture

I didn't waste a second. I ran upstairs and searched everywhere I could think of. As I entered my parents' bedroom, I saw a book laying on the floor I picked it up. The title said: Secrets within the house.

"This must be it," I whispered. I flipped through the book scanning every word there was. Suddenly a gold flash blinded me. When I turned to that page a map fell out with a key. I searched the page to see if there were instructions or anything. There was nothing that explained what the map and key were for, so I assumed that the book had done its part and the rest was up to me. I looked at the map there was a passage to Brandenburg Gate or Saint Nicholas church.

"Why would Brandenburg gate be here? But I am on a mission so that's not important. I have to find out where the library is." I said to myself. Mostly in a normal house, you would find anything secret would be in the attic or cellar. So, I went down to the cellar to see if I could find anything and if not then I would check the attic. When I opened the door, it had changed so much from the last day I was here. There were Cobwebs here and there, the broken brooms were shoved in the corner of the room and lastly, the books were sprawled and maybe even scattered across the smooth, tiled glass floor. The air smelled like fresh pine needles. Then right before me was a huge painting. Not large, not humongous, not normal everyday sized painting, but huge. It was a painting of a woman.

Her eyes glowed with happiness. The frame carving was vintage. Right below it, there was a small writing, I squinted to see what it was, and then the letters arranged themselves into a word. Eva Hitler. I blinked. I closed my eyes and pinched myself and opened them once more. Nothing had changed. The portrait was there and so were the brooms and books.

"What in the world is a vintage portrait of Hitler's wife doing in our basement!" I screamed with fury.

"First my parents were gone, and I was in this house looking for a so-called library. But now I have this portrait." I shouted. Now I really didn't know what was going on.

Chapter 3: The discovery

I was about to open the basement door despite not finding the 'library'. Then without a warning, the tile beneath my foot collided with another tile and with a crash, down I went. I opened my eyes and when I stood up everything was pitch black. Blindly, I waved my hand in the air to see if there was a lamp or something that could light this room up. My hand knocked down a box or at least something that felt like it. Finally, I found a light and switched it on. Then the room lit up. I looked around the place finding it was left in a terrible condition. But the search had not been a complete waste because in front of me was the library I was looking for. It was more of a very large cupboard with a few cushions to sit on. But at least it was something new, something extraordinary.

"How could mum call this... er... area, a library? I mean sure it has books but that really doesn't make it a..." I stopped and turned, as I did a shelf creaked and fell.

"Library." I finished with the most pathetic sigh. I saw a book on the ground and couldn't help noticing that it looked awfully familiar. Surely, I didn't see it before but something about it made my stomach lurch. Suddenly it felt like someone had flicked the light on in my brain.

"Of course! The symbol in the book is the same symbol engraved in the key. But why? They after all are two different books that just seemed to have a picture in common. No, it couldn't just be some coincidence. It had to be there for a reason and a good one too." I said. But really what did that symbol mean?

I had figured that since I already had found this library or whatever this place was called, I could go out and explore.

Chapter 4: The three of us

You see, I had never quite gone out of the house so far by myself. I usually had my older sister come with me but now, she had gone to visit our grandparents. But now I was alone so that meant I had to go out by myself. And that I could do.

I locked the door behind me so no one, except me, could get in. The wind blew my dark red hair into my face. The august chill came down like needles poking my freckles on my pale white skin. But I couldn't do anything about it. I went to Saint Nicholas almost every day to play with my friends. One of them had straight dark brown hair and brown eyes. Her name was Kiara Brown and my other best friend had long red curly hair with perfect green eyes. Her name was Lily Starfire. I spotted them nearby and even though I was on a task I swiftly ran to them.

"Hi Kiara, Hi Lily!" I spoke gasping for breath as I slumped on the grass getting my frock coat crinkly.

Kiara and Lily beamed. "Hi Audrie." Kiara said. "How come you're here, cause to be honest yo-"

But she stopped. She glanced at Lily, who glared at her fiercely through her green eyes.

"Uh··· er - not that we aren't happy to see you again." she added quickly. Lily nodded in approval. Slowly the panic started to fade away from her face.

I smiled. It felt like no time had gone by. Lily always corrected everything everyone said, and Kiara always made us laugh even through serious matters.

"It's okay. I know I really haven't seen you guys that often···. Because of a task." I explained everything that happened right from last night when they had been captured to this very moment.

"Oh··· um- well···er···the thing is...." Lily stammered. She sighed.

"Okay sorry, it's just that it's a lot to take in. Even for us. I mean sort of miserable isn't it when first you find your parents missing, and then you find that Eva girl..."

"Eva Anna Paula Hitler." Kiara said promptly. "I can't believe I know something that you don't."

"Congrats. I can't believe you know one thing that I don't know: an eighteen-letter name. Gosh, that's so incredible. Who knows maybe the world will make you famous because of your knowledge on a name?" Lily said sarcastically, rolling her eyes. "Anyway back to the topic. Ok, so Audrie tells us when we will be leaving."

"We?" I asked bemused. "What do you mean, 'we will be leaving'. You two aren't going anywhere. I am."

"Listen Audrie. You always were a bit stubborn when it came to us helping you. We made up our minds to go, and if you don't like that then, too bad, but we aren't leaving you alone to deal with Hitler." Kiara said fiercely.

"I uh···... - fine. But don't blame it on me when you two get tired of walking, get cut by branches or anything like that okay?"

"We won't." Kiara and Lily said together exchanging grins.

Chapter 5: The morning exchange

It was the next day. I woke up feeling tired. I yawned and stretched then yawned again. We were staying at Kiara's house until we set off.

"Morning Audrie," Kiara said as she came into the bedroom. "Listen, Lily woke up before, and now she is in the kitchen making breakfast. So, she asked me to come to check on you. I got out your clothes so after breakfast you'll take a shower and put them on. Okay?"

"Okay, but umm are you guys even allowed to go on this thing with me?"

"Well, technically my mum and dad are in England now to get help for the war. So, this is my house for 3 weeks, I can do whatever I want, and what I want to do is to come with you guys." Kiara said, closing the closet.

"Yeah okay," I said nodding my head in a way that would be considered malicious. "What about, Lily?" I said.

"Do you think I would know that?" Kiara said, raising her eyebrow. "Well if you want to know that story about her, then I suppose you should ask her." She finished, grinning as she glided down the stairs and vanished, leaving me sitting on the bed."

I walked down the stairs and reached the bottom and made my way towards the kitchen. I saw Lily and Kiara cleaning up the table.

"Hi Audrie, how was your sleep." Lily said beaming at the sight of me. "We ate breakfast. Sorry, we sort of waited for a long time but then we figured you were in the shower, so we ate."

"Oh, no problem, and yeah I was in the shower." I said.

"Here you go," said Lily, handing me a plate. I looked at the sausages. I didn't feel like eating, but that would be the polite thing to do.

"Er··· thanks, but I don't feel like eating." I said awkwardly.

"Of course, you don't. We know but trust us you're going to get a much better chance to be able to find your parents and to stop Hitler with food in your stomach. And by the way, when we go out into the woods or wherever, you can't get anything to eat. So, you might as well eat now." Lily said, crossing her arms.

"Fine," I said, as I looked at my plate and started eating without a single question.

Chapter 6: The storming phase

After breakfast, we set off. We walked down the lane and into the forest. Suddenly an old woman stepped in front of us. I recognized her as the schoolteacher, Ms. Pauline. She had frizzy white hair, cat-eyeglasses and a bitter look on her face.

"Here we go," I thought in my head.

"Now hold your horses. Where do y'all think yer goin'? No kids one me sight is disappearing into the forest. With Hitler's war comin' on. Y'all got that?"

"Yeah well, see the thing is that we aren't exactly kids, and if we were then we wouldn't be going through the forest." I said in a falsely sweet voice.

"Don't yeh tell me that. So, what are yeh lot doing sneaking off to the forest, 'cos yeh ain't goin' anywhere." She said suspiciously.

"We have to go to the marketplace to get some medicine for our cousin." Lily said.

"The market ain't in the forest." She said as her eyes narrowed. Lily ignored her and kept talking.

"And we aren't going to stop because someone told us to. So, if yeh don't mind, we gotta go. Bye."

"Hmph," said the woman.

"When did you start telling lies? Kiara said as we hurried off.

"When did you ask so many questions?" Lily said, smirking back. "You know what? I am starting to think it was quite stupid of me to let you come, because if you guys are going to keep arguing about lies and questions then I might as well, and if we all bicker, by the time we get to my parents, they'll probably die." I said walking in front of the pack and striding down the hill."

Kiara and Lily looked at each other.

"Would you guys like to say something or would you like to argue

about wildflowers." I snapped.

"None," Kiara whispered.

"Good, because we don't have time to do either." I said, feeling angrier by the minute. I walked further into the woods I didn't look behind. My eyes were focused straight ahead. Slowly I could hear voices.

"What now." I grumbled and turned around and saw Kiara and Lily standing 5 ft apart and having a huge row.

"IT'S ALL YOUR FAULT YOU KNOW!" Lily screamed into Kiara's face.

"OK FINE MAYBE IT IS, BUT AT LEAST I AM TRYING TO FIX IT. YOU ON THE OTHER HAND KEEP CORRECTING EVERYTHING LITTLE THING I SAY." Kiara roared back.

I took a deep breath. "Guys listen." I said calmly.

"WHY DOES THAT MATTER TO YOU. WHY DO YOU EVEN CARE? I MEAN ALL YOU DO IS LAUGH. BUT ME, I HELP PEOPLE." Lily s and soon her face was becoming red as her hair.

"Guys stop it!" I said a little louder.

"YEAH YOU TOTALLY HELP PEOPLE. HMMM……. I WONDER WHY I DIDN'T NOTICE IT BEFORE. MAYBE I SHOULD CORRECT YOU ALL THE TIME, BECAUSE LIKE YOU SAID I DON'T HELP SO MAYBE I SHOULD TRY BEING YOU. SO, I CAN HELP PEOPLE JUST LIKE YOU," Kiara snarled.

"Guys. JUST STOP!" I shouted, but my words were drowned with Lily's snarls.

"WELL BE MY GUEST," she snarled back.

"WILL YOU JUST STOP!!!" I bellowed and silence fell upon the forest. "ALL YOU GUYS DO IS BICKER AND BICKER. KIARA YOU ALWAYS SAY LILY CORRECTS EVERYONE AND IS ANNOYING. AND YOU." I shouted pointing a finger in Lily's direction. "ALWAYS HATE KIARA'S STATE OF HUMOR. BUT I AM GOING TO ASK YOU BOTH A QUESTION, AND MAYBE YOU'LL FIND THE ANSWER. AFTER ALL, YOU TWO ARE THE SMARTEST PEOPLE IN THIS FOREST. WHICH IS WORSE? LAUGHING, CORRECTING OR GETTING YOUR PARENTS KILLED BY HITLER AND THE NAZIS. BOTH YOUR PARENTS KILLED!!!" I hollered. The forest was filled with dead silence for about five minutes.

"Listen, we don't have time for this so let me ask you both a question." I said impatiently. "Lily, does laughing really seam the bad? And Kiara, don't we all make mistakes and need someone to tell us the corrections. I mean we are after all humans." I said.

"Sorry, Lily." Kiara said, who seemed to be very interested in the forest ground.

"It's okay, and sorry Kiara." Lily said standing up.

Kiara and Lily looked at me. "OK finally," I said with relief, "I don't wish to be rude, but we have to get going." They nodded.

Chapter 7: Night in Spandauer Forest

We slowly made our way towards the creek which laid in the middle of the forest.

"Guys it is getting late." Kiara said looking at her watch. "What about we camp out here just for tonight and set out tomorrow morning. Okay."

"Well, that's a good plan if we had a tent and food." Lily added. "But I think we can make it work. I swear I saw a tent in here somewhere," She said as she peered into the bag. "There it is."

"Brilliant," I said, pulling up the tent from the bag. "Now for the food. Can either of you guys cook? Because when I try to do it, I end up burning the food."

"Well…. I can cook. So, there we go." Kiara said.

After we set up the tent, we had a look inside. It was quite nice. There were 3 small sleeping bags and 2 small but foldable chairs and a table. The floor was nice as well.

After dinner, we went to sleep. When Lily and Kiara were fast asleep, I tiptoed out of the room and went outside. There were so many thoughts and nightmares in my head. Would Ms. Pauline (the lady who tried to stop us) tell the security and have them look for us? Would we get captured by the Nazis? But most importantly would I lose my friends to this task? Thinking many thoughts, I fell asleep. The next day was hot and sunny. The sun was blazing down on the grass. I stirred a bit and then lay motionless once more.

"Audrie," someone said sharply.

"Hu- wha-," I said, jerking up. The sun blinded my eyes. I looked up to see Lily's face. She looked annoyed.

"May I ask?" She started coldly looking down at me. "What in the world, are you doing?"

"Sleeping?" I said bemused.

"We woke up in the middle of the night to find you were gone and we called out your name a million times which I almost daresay gave away our hiding spot. So, we had to move everything to a different location, which includes you." She said, with a grim look spread across her face.

"Well it is not my fault is it, if I can't sleep in the tent?" I lied through gritted teeth, getting up.

Lily rolled her eyes. "Whatever," she said coldly. "Let's go and have breakfast."

Chapter 8: At the gates of Spandau Prison

As usual, we set off after breakfast. Soon we reached what would be called a gateway.

"What are we even doing here." I asked looking at the big iron gateways.

"Well···. I may not be that smart, but I am also not that stupid." Kiara said. "This is called the Spandau Prison, located in Western Berlin. Constructed in 1876 and···"

"Yes, yes. We don't have time to get into the little details.", Lily said impatiently, tossing her hair out of her face.

Kiara gaped at her as if she had never seen her.

"The important thing is this is where we think your parents maybe." She continued.

"You think," I said, raising my eyebrows. "Well, that ought to be very promising, that you think they are in there."

"Well, it's worth a shot, isn't it? Before we decided that this suggestion is worthless and skip back home." Kiara said, narrowing her eyes.

"Fine okay," I said annoyed. Kiara did have a point. "Well, what do we do now? I mean we obviously can't just walk in. Then, this would have been for nothing."

"I don't think we will have to." Lily said, smirking.

I understood what it meant, and whatsoever I couldn't help smiling.

We had our plan ready to go.

"Okay, ready guys?" Lily whispered.

"Yeah, okay let's just hope this works." Kiara said timidly.

I watched Lily go out and march up straight to one of the men guarding the gate.

"What are you doing here." He said in a deep hoarse voice.

"I think the better question is, what are you doing." Lily said in a high girlish voice that did not suit her.

The man raised an eyebrow. "Now, listen Ms, I don't have time to answer to a silly little girl or go anywhere."

"Well no one told you to answer, but, Hitler wants to see you, and if you don't want to go; like you said (her voice became more girlish) then I would be delighted to tell him so."

The man's face became red and sweaty. He looked scared to death. "Nah, of course, I will go. Whatever master wants, I will get him that." And without thinking, he started to walk away."

I saw Lily coming back.

"Hitler may be clever and smart, but his men are quite the opposite." She said.

"Come on, we don't have much time. Sooner or later that man is going to realize what I said was a trick." Lily said, pulling us up by the hand. And so, we went into Spandau.

Chapter 9: The Escape

It looked horrible.

"I think we are supposed to go there," Kiara said pointing to a black dusty tunnel.

I sighed. How were we going to find my parents here? “Okay, lead the way, Kiara.” I said pathetically.

We walked on forever. I had started to think this was never going to work out. Suddenly I heard voices.

“There should be an exit right here - unless···. No,” Kiara muttered.

“What about here in cell 15,” Lily asked pointing at a picture on the map.

“Guys, can you be quiet for once.” I said looking back into the tunnel.

“I think one of the girls got in here.” The man said who had been guarding the door.

“I thought I had told you to guard it, didn’t I?”

My stomach lurched even worse. I recognized that voice and the man who owned was Hitler.

“But master, a girl told me you wanted to see me.” The man said in a sympathetic voice.

“And you believed her? A stupid girl’s story. You idi···.” His words however were cut short, he looked at us. At the speed of light, I quickly shoved Lily and Kiara aside. “Guys, we have to get out of here,” I said looking back.

“As soon as we find your parents.” Lily corrected.

“Do you even know if they are in here.” I said getting anxious every second. “And if they are, then we have to get them as fast. Because I just found Hitler with one of his men outside talking about us! And by us, I mostly mean you, Lily. Hitler and that man have probably figured out that the thing you said was a trick.”
They nodded. We hurried yet once more and suddenly Kiara stopped with a jerk.

“Audrie, thank you for coming,” A woman said and slowly she relieved herself. It was my mum. Her red hair was flowing in the wind and her brown eyes were glistening in excitement.

“MUM!!” I screamed as I ran forward to see her better.

“Mum, we got the key to free you. Now, all we need is Dad if we can find out where he is.”

“Oh, I don’t think it’ll be hard.” she said as she pointed to the next cell. I peeked in there and saw someone with brown hair and blue eyes. He beamed when he saw me. “Audrie, you’re here.”

“Yes, now here let me··· one second... if I could... There,” I said, unlocking the door. “Now for mum,” And like normal, I was able to unlock it.

“Hello, Mr. and Mrs. Levesko,” Kiara and Lily said, waving at my parents with two huge smiles on their faces.

“Hi girls,” Mum said smiling back. “How are you doing, but before that how on earth did you manage to find us?”

I was so happy that I could tell every, single, little detail, but then I remembered. “Of course, we’ll tell you, but not now. I think it is time to go.”

And there we went out into the sunshine striding down the path, without one single glance at the Nazis or Hitler, straight down the Spandauer forest and back home.

Chapter 10: Out in the open again

The sun shone brightly as ever. I woke up lazily and sat up. We had managed everything. By we, I meant Kiara, Lily, and me. We had managed Ms. Pauline, the fight, the night in the woods, and even getting my parents back. “Come on Audrie, get up.” Mum said from down the stairs. “When did you get so lazy!”

I smiled, and down the stairs, I went. When I had arrived, I could only see mum and dad. “Where are Lily and Kiara.” I said looking down and my omelette, toast, and orange juice.

“Well, we owe you girls a huge amount of gratitude, from saving us from Hitler.” Dad said, looking up from the newspaper.

“So, we decided that we should all have a small picnic in the backyard, and since Kiara’s and Lily’s parents are still out for two weeks, so they can stay with us till they have to go! Does that sound good.” She said getting up from the table.”

And like once more I said, “Brilliant!”

We were out in the yard with Kiara and Lily. Dad was telling them jokes, that made them laugh like crazy.

“Mrs. Levesko, is it alright if we go and have a ride in the swings across the lane.” Lily asked, looking hopeful.

"Why, of course, but let him come with you." She said pointing a finger at dad, and with a blink of an eye, they went.

"Aren't you going with them, Audrie?" She asked me.

"I still have two weeks to play with them, so I would rather not today. Not to be mean or anything but I just want to take a break today." I said, staring at the endless blue sky. "You know what mum, you were right."

"About what," she replied, staring at me bemused.

I turned to face her and smiled back. I had never felt so happy in all my life, and at that moment, I said what I had meant to say all this time. "That when it came to me helping you and dad. I really never was alone," I said.

The End

Why is Durga Puja 35 days after Mahalaya in 2020?

Raja P Kumar

It seems mother **Durga** planned to delay her visit due to Coronavirus. Some say it is due to **malmaas** (**মলমাস**). What is this **malmaas**? It is nothing but an extra month (**অধিকমাস** or **মলমাস**).

Why do we need an extra month? Was it on buy-one-get-one sale? Like many other things in 2020, no one asked for it. What should we do with this extra month?

We have to start with the Indian method of timekeeping. Ancient Indians were master timekeepers, using astronomy and mathematics. Those calculations reflect in the calendars we use today. Hindu calendar refers to a set of various lunisolar calendars meaning calendars following the lunar cycle and solar cycle. The calendars define a particular day with five limbs of time.

This is the definition of Panchang (**पञ्जिका** in Bengali). Tithi (**तिथि**), Day of the week (**वार**), Asterism (**नक्षत्र**), Yog (**योग**), Karan (**करण**) and this whole universe is nothing but Vishnu.

तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च |
योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् ||

Using these five (5) attributes, astronomical timekeeping is done. Let us also keep things simple without extra astronomical details and move from lunar days to lunar months.

In a lunar year, twelve (12) lunar months are further divided into six (6) lunar seasons timed with the agriculture cycles, blooming of flowers and leaves, monsoon, autumn (fall), harvest, weather etc. and most of the festivals follow these traditions. Most of the festivals are celebrated using lunar calendars with a few exceptions (e.g. **sankranti** – when Sun moves from one zodiac sign to another etc.),

A solar year is about 365 days. Twelve (12) lunar months equal to approximately 354 days. This creates a difference of approximately eleven (11) days. About every three (3) lunar years, there are about additional 33 days that need to be offset. If not taken care of, most of the festivals will precede slowly meaning come earlier in the solar year and won't coincide with the seasons anymore (remember – **sharadiya pujo** (worship in autumn). To keep the lunar and solar calendars aligned, an extra lunar month is added to the lunar calendar every three (3) years. This method of adding extra lunar month is one of the most accurate methods to adjust the difference between lunar and solar year.

This extra month is considered inauspicious and hence performing religious rites, rituals, festivals, etc. are pushed away by one lunar month to maintain the order as discussed above.

This year, extra **Ashwin** month will be from September 18 to October 16, which is immediately after **Pitri Paksha** (fortnight of the ancestors) and hence the start of **Devi Paksha** (fortnight of the goddess) is delayed by one lunar month. Every year **Durga** puja starts on 6th bright (waxing moon) lunar day (**Shukla Shashthi**) of **Ashwin** lunar month. This explains why **Durga Puja** is delayed this year.

As an ending note, new moon **Mahalaya** (last day of **Pitri Paksha**) is often confused with **Mahalaya** celebrations in Bengal as day 0 of **Durga** puja festivities which marks the creation of Goddess **Durga** from Clay. But that is a story for another day.

A Memorable Trip

Aniket Sen, Freshman, Aurora, OH

Do you remember the time before COVID-19? Those were the days when we could interact, have fun, travel, and memorable experiences. But now with the pandemic going on, we can't do much. The only thing we can do right now is to stay locked in our homes, which is dull. There are only so many video games one can play and study online. This reminds me of a memorable experience going to Disney World. Try imagining what it would be like in the present circumstances, with social distancing and infection scare. I have been to Disney World twice, once when I was five years old and recently in 2018. I barely remember anything from the first trip but the recent one was a more exhilarating experience for me.

Back then, one could plan trips whenever and wherever they wanted to go. It was so much fun to travel around, eat different food, and no schoolwork. I had been to many other trips with my parents, sometimes they planned ahead and sometimes they decided something spontaneously. My sister had been asking about Disney for quite some time, but my parents were not sure. Suddenly, we started thinking about it around Thanksgiving of 2018. But we did not tell my sister because we wanted to surprise her. We broke the vacation into two parts, first tour some parts of Florida and then end up in Disney World.

We started our trip on Christmas Eve by flying to Orlando and then drove to Sarasota. The first part was okay but it was not exciting. We went to beaches, national parks, and Miami. Back then, Florida was jammed with people due to the nice weather there all the time. But now with quarantine, not many would be outside these days. Also, more COVID cases are surging in Florida because it is a big and populated state.

Finally, after five days of waiting, we arrived in Orlando. We tricked my sister that we were going to return home without visiting Disney. As a consolation, we will take her to see Disney Springs that night. But little did she know that the real trip was starting the next morning and it would be filled with crazy excitement for the next 5-6 days. It was funny when we saw her sad expression and I had a hard time holding back my laughter. The next morning, we moved to the Disney All-Star Movies resort. We visited all the parks - Epcot, Magic Kingdom, Animal Kingdom, and Hollywood Studios.

As a kid, I liked the Magic Kingdom park and the Buzz Lightyear ride a lot. But this time I enjoyed the Haunted Mansion more. In Epcot, I enjoyed the Test Track ride. In fact, I had to go alone because it was popular and crowded. In Hollywood, I met Kylo Ren and took pictures with him. I also went to the Twilight Zone Tower of Terror, way more fun as a teenager. We spent New Years' Eve at Hollywood Studios and watched the countdown there. The best part was getting on the Avatar ride at the Animal Kingdom, and due to some lucky breaks, we were able to do it twice despite having no fast passes for it. People had to wait for 4-5 hours just to get on it. We ate a ton of nice variety of food there every day because we had signed up for their dining plan.

Finally, the day before returning home we chilled out at the resort swimming pool. The next morning, we boarded the mouse bus back to the airport and flew back home. In a few days, I was back in school and life was normal. I never thought that in about a year's time, the pandemic would hit and the trip I just had would be next to impossible anytime soon. I am hoping some treatments and vaccines will come out soon and we can go back to our old normal.

In case you do decide to visit while the pandemic is still going on, Disney World is now different and there are new guidelines that all visitors must follow. You must book a reservation online prior to coming to the park, you cannot just buy tickets at the park. At the entrance, everyone has to undergo a temperature check. If anyone in your party has a temperature of 100.4 degrees Fahrenheit or above, no one in your party will be allowed to enter. Employees and guests 2 years old or older are required to wear a face mask. For social distancing purposes, there will be limited guests at a given time to enter the park or go on a ride. You must follow the ground markings and physical barriers. There are enhanced cleaning stations for all guests and employees.

Stay healthy and safe!

Guitly, Though Never Charged

Swapna Banerjee

It was Thanksgiving Day, several years ago. I used to live in Pittsburgh, PA in those days. We were planning a Thanksgiving family get-together. Since at that time we all lived in different places, there were logistical problems with the plan. My husband was living in York, PA during that time, where he did some consulting work. Our two sons were living in Boston, MA. I would have liked to have all of them come over to my apartment, but it had only one extra bedroom and the eighth-floor apartment in a high-rise building was not very practical for the puppy, my sons were bringing with them. Since my husband was renting a town house with ample room, meeting there seemed to be the most viable option.

I had been cooking in the evenings after work for a few days prior to this day. On Thursday, which was Thanksgiving Day, I got ready very early in the morning and dragged the large foam coolers to the underground parking garage to my car. I had a few hours of driving ahead of me, so I didn't waste any more time. My husband had invited an Indian colleague of his who was also living away from his family and lived in the same townhouse complex. Because of that, I couldn't afford to be late.

As expected, as soon as I hit the highway, I faced dense traffic, all in a hurry to be with their families for an early dinner. I was surprised to see a large number of motorcycles on the road. I thought that was unusual for that time of the year when the weather was definitely chilly, until I remembered that York is the home of Harley Davidson's main assembly plant and there is always some kind of motorcycle rally going on there.

Around noontime I pulled into the largest rest area in between the two cities. It was extremely crowded. It seemed everyone had stopped for lunch. The huge parking lot in front of the building was full and cars were waiting for a parking spot. Fortunately, I had my lunch with me, so I drove away from the building towards an empty space near the truck parking area. As I settled down with my sandwich, I called my sons to make sure they were on their way driving from Boston. I then called my husband. It was decided beforehand that my husband would buy and prepare the turkey while I will be bringing in the rest of the foodstuff. The night before I had explained to him how to clean and marinade the turkey Indian style with yogurt and spices. I now asked him if it was in the oven. "What?", he sounded panic stricken. "You said marinade. Do I have to cook it also? Can't you do that when you come?"

Now, my husband was willing to do almost anything, but he cannot, or would not, cook. Almost every weekend when he visited me in Pittsburgh, he would bring bags full of groceries with him and then go back with coolers full of cooked food. I patiently explained to him that it was not enough to marinate the turkey, but he also had to cook it, since a turkey takes three to four hours to cook, and he had a guest coming for an early dinner. He said, "but I know nothing about cooking a turkey!" I advised him not to panic. All he had to do was to check the wrapper to see how much it weighed, and the cooking time would depend on the weight. He would find the instructions on the wrapper as well. He agreed grudgingly. It was only many months later that I found out that he had panicked because he had already taken out garbage with the wrapper thrown in it. At that point, there was only one thing he could do. He took a good look at the marinating turkey and went back to the grocery store. There he looked at the few remaining turkeys on the shelves and found one that looked "similar" to his own turkey, and read the instructions on it before coming back and putting the turkey in the oven (those were the days before the proliferation of YouTube cooking videos).

While I was talking on the phone, I could hear some loud noise behind me but wasn't paying much attention to it. I turned around and saw two men with motorcycles behind me. The two riders were big, burly African American guys who wore typical bikers' leather jackets with club insignias. They were slowly moving around, looking towards all sides. Very soon they were circling around my car as if looking for something. The noise intensified into a rumble of thunder and I saw in my rearview mirror that about twenty more motorcycles were speeding towards me. They were all African Americans, so they didn't quite fit into the stereotypical image of motorcycle gangs which usually comprise of white men, but they were nevertheless all members of some sort of group, wearing leather jackets. Within seconds they were

swarming all around me, engines roaring, music blaring, the riders talking, or rather, screaming at each other.

I started perspiring. Why were they surrounding me? There's plenty of space on the sides that they could have used, so why here? I reasoned with myself, it is broad daylight, for goodness' sake, and I can clearly see the main building! Surely all those parked trucks have drivers sitting in them who can see us as well?

They eventually gathered on one side of my car, turned off their engines, and after getting off their bikes started stretching their limbs. Soon two large vans drove up to them. The doors opened and little children started spilling out of them and ran to the men. A number of ladies also got down and some of them walked to the rest area with the kids. The men went and opened the back doors of the vans and started unloading large coolers, water jugs, even a folding table. The children ran around my car, screaming, laughing, playing, while their mothers set up the table. Little girls in pinafores, with cute little pigtails and corn braids, little boys in brightly printed shorts frolicked around my car. Some of them waved at me. I was ashamed to realize that there was nothing sinister about those men on bikes. They were just traveling with their families to have a good time at a motorcycle rally. The two guys who came first were probably just sent ahead to scout for a good parking spot for their large group. Soon I was on my way.

After spending two marvelous days with my family (and the puppy), it was time for me to drive back on Sunday morning. On my way back, I stopped at the same rest area, albeit on the other side of the highway, and again, after parking away from the building, opened my "Dubba" packed with the leftovers and settled down for my lunch. By the strangest coincidence, once again I heard the roar of motorcycles and, lo and behold, the same group arrived and parked next to me. I think some of them recognized me too. I rolled down my window and talked to the children. This time when I left, even the adults waved at me.

I never thought of myself as racially prejudiced. People from my generation who grew up in India were exposed to caste discriminations. While these days it seems that we are gradually moving past that unfortunate trend, it is being replaced by the trend of intense class discrimination perpetrated by India's rapidly rising nouveau riche middle class, who tend to flaunt their prosperity to distinguish themselves from those who are less fortunate. If we are, to be honest, we need to ask ourselves if caste or class discriminations are really much different from racial discrimination. I deluded myself into believing that I was quite progressive, yet I let my judgment be clouded with not one, but two biases, one based on race, and the other based on the stereotypical negative image of vicious motorcycle gangs. In this instance, at least, I hold myself to be guilty, even though I have never been charged with it. With the current trend of rising awareness of racial discrimination, maybe we should all strive to recognize and bring to the surface our own buried biases and try to uproot any kind of discrimination that we ourselves are guilty of.

শারদ শুভেচ্ছা

জয়দীপ, অম্বালিকা, পিয়াল দাসগুপ্ত, কোয়েল ও গাভান লকহার্ট

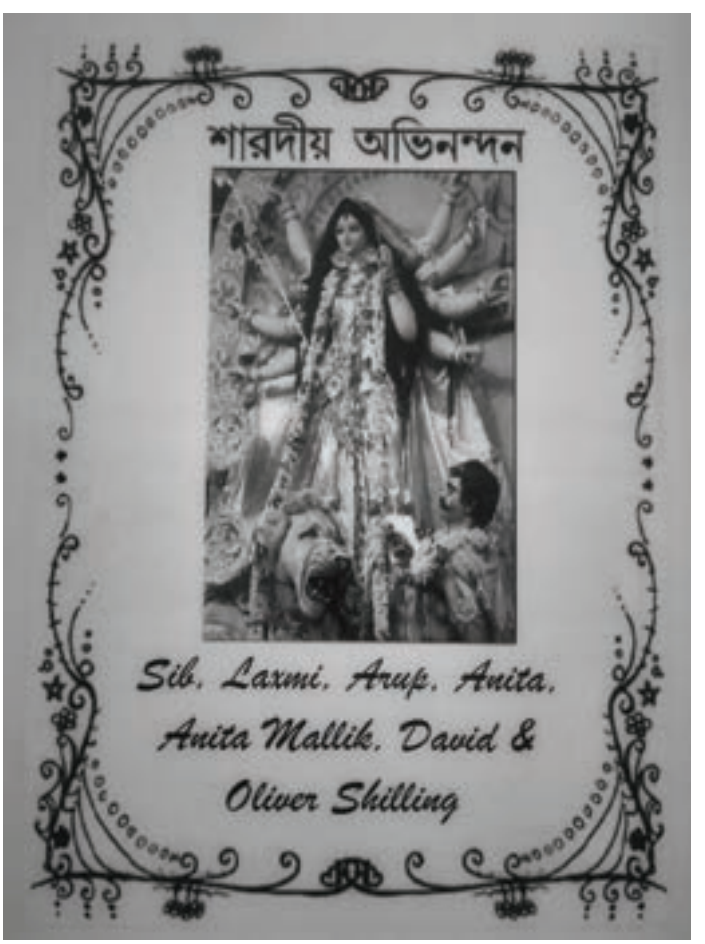

Sharodiya Shubhechha

from

Nandana, Adri, Nilanjana and Sudipto Mukherjee

Best Wishes and Puja Greetings

TATINI AND SANCHITA MAL SARKAR

Neorealism in Satyajit Ray's Movies

Mandira Chattopadhyay

The year 2020 marks the start of the centennial year of Satyajit Ray' birth and is an extremely important time to remember him. He remained to the end indifferent to the movie world glamor. He was a great admirer of the neorealism movement that originated in Italy. Neorealism does not have a heavy plot, usually has an episodic structure, focused on ordinary problems, an everyday struggle. The movies in this category are characterized by seemingly uneventful plots, centered on the characters. Pather Panchali authored by Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay was published in 1931. Satyajit Ray read this novel in the 1940s while he was an advertising artist and an illustrator. He was asked to do the illustration for the new edition of the book. That's when it struck him that the book would make a great film. Satyajit Ray and the movie, Pather Panchali go hand in hand. But we should recognize that two leading directors, Vittorio De Sica an Italian, and Jean Renoir, a Frenchman were indeed instrumental in shaping his thoughts.

Since my high school days, I was drawn to Satyajit Ray. A tall, stoic figure clad in white kurta and pajama who was always accompanied by one of his assistants, he would circle around my grandmother's neighborhood in Lake Temple Road of Calcutta. As I became a college student, my friends and I as young girls, watching our physique and development, admiring each other's beauty, the idea of becoming a movie actress or an air hostess would often crop up. In my grandma's house, I overheard that Satyajit Ray would sit in his living room and welcome anyone irrespective of their ages to audition for a role in his films. One day we tiptoed our way in front of his house. The doorkeeper with a wide mustache at the gate asked us, "What do you want?" Not prepared to answer him, we were scared and ran away from the scene. Even to this day, I think I should have auditioned for a role in his movies since I always enjoy acting.

In 1950 he went to England for a while, for his firm, and while he was there, he saw more than ninety films. He was studying everything in the films ceaselessly. But it was the theme of Bicycle Thieves that gave him the idea of how to make his own films. No stars, mainly on location. The post-World War II Italian neorealist movement was based on making films on the street, observing people in the surroundings with an immediacy that was powerful. Satyajit Ray's art of extracting spontaneity from untrained and new actors was something he learned from Vittorio De Sica. He thought De Sica was a master of handling actors as puppets, telling them what to do next. He maintained that in Vittorio De Sica's Bicycle Thieves, the young boy's acting was amazing, particularly in the last scene where the boy holds his father's hands and starts to cry. When Ray asked De Sica as to how he came up with that scene, De Sica replied that he poked fun at the poverty of the boy's family and made him cry. De Sica continued," I was so ashamed of myself when I got to that scene···it was so shameful of me." He said, " "my little boy" was so very proud and lived in such a poor condition in the same room with his mother and father and his brothers and sisters and they all slept on the same bed and yet he was terribly proud, and he didn't want anyone to make fun of that; so I made fun of it and made him mad, and he cried, cried and cried. After that, I grabbed and kissed him."

In the second film of Ray's Apu Trilogy, Aparajito, there is a scene towards the end where the mother is dead, and the boy sits and cries on the little verandah; the old man sits smoking his hookah, and he consoles Apu by saying – "You know, man is not immortal. Everybody has to die sooner or later, so don't cry." That old man was a complete amateur. Ray found him in Benares on the ghats, the steps going down to the Ganges. He asked him whether he would be willing to act in the film, and he agreed. This old man was a real amateur with no sense of acting at all. This is the technique that he learned from De Sica.

Ray believed that children are not always natural actors and that some of them are very hard to handle. He would treat children as adults and take them in his confidence. He would whisper directions to them and never speak aloud to them. He felt that whispering to them would imply something confidential was being communicated to them, so they would immediately get interested. When he was working with Apu it was very difficult. Like De Sica he wanted to know the person he was working with, know his moods, his abilities and his intelligence. In the scene where Apu is looking for his sister in the field of flowers, Ray admitted that the walk was very difficult to get it right. So, he put little obstacles in

his way which Apu had to cross, and it became natural immediately. Apu was stiffening his body too much. So, Ray put a number of objects in his path to extract the right mood. That is the most difficult thing to do just to look for somebody. There were a number of exceptions as well. The girl Ray picked to play the role of Durga, Apu's sister in Pather Panchali, he said had great natural talent, so he did not have to work with her too much. The girl Ray picked to play the role of the servant-girl in the movie Postmaster, he found to be very intelligent, an amazing eleven-year old, to whom he could tell the entire story. He told her, "When you go, look here, and look there." To Ray, it mattered, as he would carefully rehearse with the girl, in terms of where she was looking, how long she would pause, and these pauses were dictated by him. These looks and pauses would create the mood even for the professional actor Anil Chatterjee, who played the role of the postmaster in that movie.

Jean Renoir, who had similar cinematic affinities to De Sica, also influenced Ray. Renoir came to India to make the film The River. When Renoir began to look for locations for the movie, he put an ad in the newspaper and started to interview actors for various plots. As the advertisement manager for a newspaper, Ray came to know that Renoir was in town, and subsequently accompanied him on his location hunts, because he was quite familiar with the countryside. The conversations between Ray and Renoir were extremely enlightening for Ray. Renoir would insist on details and the value of details in his films. They would drive through the countryside, and Renoir from time to time would say, "Look at that!" He would point to a clump of bananas or plantain, and would comment, "This is Bengal, that little palm, that is quintessential Bengal for me." He was always trying to find in the landscape details that he felt were characteristic of the place and he was hoping eventually to use them in the film. All these left a deep impression on Ray, because he too was interested in the details.

Renoir had influenced Ray immensely. By that time Ray had already made illustrations for a special edition of the novel Pather Panchali. He was already a film buff and started a film club in Calcutta. He was toying with the idea of changing his profession because he was getting a little tired of advertising. He told Renoir what he had in his mind for a film, to which Renoir encouraged him strongly to go for that. But Ray had not started writing the script then. He wrote his first draft on his way back from England by sea.

Like Renoir, Ray the director looked, looked and looked again at the same time that he ever listened, building his films through painstaking observations and assisting his players to act with that suggestion of unforced naturalism which looks spontaneous. His sensitive work with actors is part and parcel of his film and has been characterized as a humanistic cinema comparable to Jean Renoir, and Vittorio De Sica's The Bicycle Thieves influenced him making Pather Panchali, in the same way, using natural locations and unknown actors.

He spent more time at locations with actors and their surroundings. Historically in European cinema, there has been much dependence on constructing an image from component parts as in American filmmaking. But Satyajit Ray went outside the studio. Shot on location in Calcutta, his The World of Apu (1959) is his last film of the Apu Trilogy, including Pather Panchali (1955) and Aparajito (1956) in which the culture is exposed by seeing the characters in their landscape.

Ray's work drew on the Bengali novel and to some extent on the New Theater's attempt to bring literary respectability to the cinema. Bengali films were either the conventional ones modeled on Hollywood, their structure and climaxes derived from theater, or they were devotional, or again, mythological. The only kind of professional encouragement he got from one single man who had worked with Renoir on The River had told him of his plan, and later when he met Renoir he insisted that he should not give up and he didn't and by 1952 he had scraped together enough to make a beginning.

Even to this day, I regret that I did not step into Satyajit Ray's house and did not give him the narrative of the Deoghar house of my grandparents. How I was not pleased to hear when I was in the Lake Temple Road, as I was getting ready to pursue graduate study, that my uncle had finally made the transactions on the Deoghar house, and my delights of childhood were gone. The strolling of the path through the mango trees, or the path to the guava trees. Uncle said that he was sad to hear that the grandpa's age-old gardener claimed that they should receive the lump sum profit from the sale of the estate, since Deoghar was their land, and my uncle was shocked to see the gardener's family and that of the housekeeper armed with bows and arrows sitting inside the house over their land. Satyajit Ray could have made a great movie about this human struggle and human suffering and bring his art of neo-realism with his love for ordinary people.

Life Is A Rainbow

Rajonya Pramanik

She didn't treat me fairly; a girl thinks to herself.

The girl walks into a chilly spring night. Her face is red and tear-stained, and her eyes are angry. She is wearing a wool coat which is not warm enough for that night. She grips the coat tightly around herself and walks faster, trying to be warmer.

She opens the door to a café and the bell jingles cheerfully, welcoming her. The sound makes her feel irritated and angrier. It is fake, she thinks to herself.

The café is pretty empty, but the girl chooses to sit on the table where an elderly gentleman in his sixties is reading an old, worn paperback book. Maybe she needs someone to comfort her. The girl sits down with force and the chair resists under her weight. She grunts. The man looks up, startled by the movement and noise. It takes a moment for his eyes to adjust to the present. Must have been pretty deep into his book. People like the fictional world, not the real one. That is why they read books. The girl thinks to herself.

The man looked at her. "Are you okay?" he asks, genuine concern in his eyes.

The girl glares at the man. "Look at the children these days. No politeness. No respect." The man shakes his head sadly.

The girl takes a sharp breath. She tries to count to ten. She closes her eyes and thinks of flowers. Nothing works and she loses her temper.

"What do you mean? You with your balding head and retired life. You think that you can just look at any teenager and say how you were better. I don't have respect? I am not polite?"

The man shrugs. "Well, I'm not the one yelling at a person older than me and asked me if I am okay."

The girl looks around. The few people in the café, most with laptops or headphones are looking at her. The barista gives her a sign that says: chill out.

The girl takes a deep breath to calm down. "I am sorry. It's just that my mom yelled at me today and it just really pissed me off. I am sorry."

"Why'd she yell?" The man asks. The girl looks at him. He really looks curious. It doesn't look false. She decides to tell him the big details and spare small ones She tells him about how her mom yells about every small thing. How they don't talk much. How she spends almost all the time in her room. Playing video games, ignoring her mom's calls from downstairs, calling her friends, and sometimes studying. "Well, I got a tattoo today and-and she was just really angry with me. She···she called me a spoiled brat and that I didn't care about her and her feelings. And···" The girl feels tears welling up in her eyes. Questions scratch her mind, desperate to get her attention. Why did her mother say such things to her? The girl did care about her feelings, she told herself. Doesn't she?

The girl digs her fingernails into her palm trying to stop her tears. They don't stop. Why don't tears ever run out? The girl asks herself.

"Don't worry about it. She cares about you and she wants the best for you." The man replies.

"Ha!" The girl laughs. But it doesn't reach her eyes. It is a cold and hollow and dark laugh. "' She wants the best for you.' Don't you adults have anything else to say? Other than that? If she does, then why did she say those things to me? Why did she make a big deal out of the tattoo? Come on, it was just a tattoo! Maybe she just wants to fight. Maybe she never wants me to be happy." The girl realizes that she has been yelling and looks around again. Not many people look up this time. They are getting used to it.

"Did you ask her?"

"Huh?"

"Did you ask her before you got the tattoo? Did you ever ask her

before you did anything?"

She hadn't asked. She hadn't asked before the tattoo. Or, now if she thought about it before she got anything for that matter. She hadn't asked before she sold their washing machine to help pay off the bank loan. She hadn't asked her when she signed up for the school trip to Washington D.C. She hadn't asked before she took up the job offer in Walmart. She hadn't asked her before she did anything after her father died in a car crash. That was eight months ago. Her mother had been at the wheel.

The girl closes her eyes and thinks. She thinks about the good memories. She thinks about the time before her father died. Before they had leftover pizza slices for dinner every night. Before she stopped talking to her mom. Before she stopped listening. She thinks about how they used to go to the movies on Sundays. How they used to laugh at her dad's lame jokes. How her dad used to bring flowers every few days. She thinks about her mom. About how when she smiled the dimple on her left chin would show. How when she would be upset, she would scratch her thumb. When was the last time she had seen her mother smile? She couldn't remember.

Now it was different. Now all they had for dinner was pizza or take-out Chinese and most of the food went to the trash. She didn't even like the food. It felt dry and cold in her hands. Her mother tried to talk to her, she did. But in the end, she got tired, said "you enjoy, I'll work" and went to work at her home office, her food left untouched. They never watched a movie. And when was the last time they went to a mall? Forget that. They didn't even speak to each other. Well, she didn't.

The girl's mother had tried. After the crash, she had tried to comfort the girl. To speak to her, to listen to her. But she pushed her away. She stopped talking to her, stopped listening to her, stopped answering her questions, ignored her attempts to do something together. They didn't go to the movies together now. They didn't to the mall. They didn't cook together, didn't eat together. They didn't do anything together. The girl had also stopped asking her before she did anything.

"Earth to you." The man was talking to her, she realized. "Well, it's getting late, so I have to go." He smiles at the girl. She smiles back. He leaves. The bell jingles cheerfully. She smiles again. The girl looks down and sees that there was a hot cup of coffee in front of her. She smiles once more. Now that the tears had dried, her cheek feels cold and moist. She puts the cup of coffee to her cheek. The girl gets up and leaves, ready to form a new bonding. Ready to forgive. Ready to love again.

I am going to treat her fairly; the girl thinks to herself as she walks back home.

আমার কথা কি তোমারও?

সুদেষ্ণা বিশী

মাঝে মধ্যে না নিজের কথাও একটু আধটু বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কেনই বা লোকে শুনবে আমার কথা? আমি তো কোনো বিখ্যাত লোক নই – হাজার মানুষের ভিড়ে হাঁটতে থাকা একটা সাধারণ মানুষ, যার জীবনে নিজের মতো করে সাফল্য আর ব্যর্থতা দুই-ই আছে। কোথাও যেন মনে হয়, আমার এই কথাগুলোই হয়ে উঠতে পারে তোমারও না বলা কথা হয়ে।

ছোট্ট বেলায় যত্ন করার কত্ত লোক ছিল – ছুট্টে এসে চোখের জল মুছিয়ে দিত, সারিয়ে দিত মনের রোগ। তখন কাঁদতাম যেমন নির্ভয়ে, তেমনি হাসতামও স্বস্তিতে। কিন্তু এখন কাঁদতে ভয় করে, পাছে লোকে বুঝে যায় আমি ঠিক কতটা দুর্বল। আর হাসিটাও কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে – কতটা হাসব, কিভাবে হাসব, কখন হাসব, আর কার সামনেই বা হাসব। সামনের মানুষটা যদি বুঝে ফেলে যে আমি দারুন সুখী, তাতেও যে মস্ত বিপদ। তাই প্রাণ খোলা হাসি আর নেই – লুকিয়ে পড়তে পড়তে গেছে হারিয়ে। হাতে গোনা ভালো মুহূর্ত গুলো ডাল ভাত আর বিরিয়ানির তফাৎ খুঁজতে খুঁজতে আজ অনেকটাই ফিকে।

লোকে আমায় অহংকারী বলে – হ্যাঁ, আমার প্রচুর অহংকার আছে। ওই যে আমি দূরত্ব বজায় রেখে চলি – তাই আমি অহংকারী; অহংকার আছে সেই সব লোকেদের কাছে, যারা আমার হাতটা ধরেও একদিন হ্যাঁচকা টানে ছেড়ে দিয়েছিল। আমি অন্যের কথায় খুব একটা প্রভাবিত হই না – তাই চলি নিজের মতেই। হ্যাঁ, আমি জেদী – আমার ভদ্রতাকে যারা দুর্বলতা ভেবে আমাকে বারে বারে আঘাত করার চেষ্টা করেছে, তাদের কাছে আমি জেদী; জেদী আমি সেই সব মানুষের কাছে যারা আমাকে ঠকিয়েছে। মানুষের কাছে বারে বারে ঠকে গিয়েই আমি মানুষ চিনতে শিখেছি। জীবনে ভুল করেছি অনেক, কেউ কোনো দিন হাতে ধরে আমায় শেখায়নি কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। হাজারটা ভুল করার পরও আজ আমার ভালো বা মন্দ, ঠিক বা ভুল এর দায় শুধু মাত্র আমার একার – একাই বয়ে নিয়ে চলেছি। আমার প্রতিটা ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছি, কিন্তু কাউকে কোনো দিন দোষারোপ করিনি ঠকানোর জন্য – করিনি কোনো আক্ষেপ বা হা হুতাশ। নিঃস্বার্থ ভাবে ক্ষমা চেয়েছি তাদের কাছে, যাদের কাছে ভুল করেছি। অভিশাপও দিইনি সেইসব মানুষগুলোকে যারা আমাকে প্রতারণা করেছে, বরং ধন্যবাদই দিয়েছি যে চলে যেতে যেতে তারা শিখিয়ে দিয়েছে সঠিক মানুষটাকে চিনতে। সামনের মানুষটার চোখের দিকে তাকিয়ে অকপটে সত্যি কথাটা বলতে গিয়ে সামান্য লজ্জাবোধও হয় না। বরং সময়ই আমাকে শিখিয়েছে অহংকার বা জেদ থাকা মন্দ নয় – এইগুলো নিয়েও যে লড়াই করা যায়, দারুণ ভাবেই জীবনকে উপভোগ করা যায়। চাই শুধু আত্মবিশ্বাস আর ভুল করলে ক্ষমা চাইবার মানসিকতা।

আমি সহজে প্রেমে পড়তে পারি আবার সহজে মানুষ ছাড়তে পারি। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে চেনা মানুষগুলোকে অচেনা হতে দেখেছি – ক্রমশ তারা সরে গেছে পাশ থেকে। চূড়ান্ত অসহায় লেগেছে যখন সম্পর্কগুলোকে চোখের সামনে ভেঙ্গে যেতে দেখেছি – এই ভাঙাচোরা সম্পর্কগুলোকে অস্বীকার না করলেও উপেক্ষা করতে পেরেছি, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করলেও মনের ভিতরে কোথাও তুলেও রেখেছি। বুঝেছি যে যদিও প্রতিটা সম্পর্কের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকা দরকার, তবুও গোটা জীবনে হয়ত হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া কেউই পাশে থাকে না – তাই সবাইকে খুশি করে একসাথে চলা বোধহয় অসম্ভব। সময়ের সাথে সাথে জীবনে এমন অনেক মানুষ পেয়েছি, যারা ছেড়ে যেতে যেতে বুঝিয়ে দিয়েছে একলা হতে থাকা পৃথিবীতে আমরা ঠিক কতটা একা। শুধু পাশে থাকার অভিনয় করি মাত্র। তাই হয়তো বারে বারে প্রেমে পড়তে চাইলেও প্রেমে পড়া আর হয় নি – আদপেই তারা বুঝিয়ে দিয়েছে আমাকে দয়া করা যায়, করুণা করা যায়, হয়ত বা আমার উপর মায়াও হয়, কিন্তু আমাকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোবাসা যায় না। তাই ভেঙ্গে পড়লেও নিজেকে আবার সাথে সাথে গুছিয়ে নিয়েছি – তাই বলে ভালোবাসতে ভুলে যাই নি আজও।

জীবনে কখনো নিজেকে কারোর জন্য বদলে ফেলিনি এই ভেবে, যে হয়তো একদিন শুনবো যার জন্য বদলে ফেললাম, সেই বলছে "তুমি আর আগের মতো নেই"।

ঠিক লোকাল ট্রেনের প্যাসেঞ্জারের মতোই জীবনে এসেছে অনেক সহযাত্রী – কেউ বা হয়েছে স্বল্প স্থায়ী, কেউ বা দীর্ঘ স্থায়ী। তাদের সাথে যে সুখদুঃখের গল্প করিনি এমনটাও নয়, দেদার আড্ডাও মেরেছি, বিপদে আপদে পাশেও দাঁড়িয়েছি একে অপরের, কিন্তু তবুও নিজেকে জমা রাখতে পারি নি কারো কাছে – পারি নি কারো সামনে নিজের গোপনীয়তাকে ভাঙতে, পারি নি তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে – তাই তারা সাথী হয়েই থেকেছে, বন্ধু হয়ে ওঠেনি। ক্রমশ বুঝেছি, যতই থাকুক চেনা মানুষ, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব জগৎ থাকা খুব দরকার – যেখানে শুধু মাত্র আমিই বিরাজমান, যেখানে আছে একাকিত্বের আরাম। জানি না নিজস্ব জগৎ কাকে বলে? তবে এটুকু তো হলফ্ করে বলতেই পারি যেখানে আমার সুখ দুঃখগুলো নিজের চিন্তার বেড়াজালেই আবদ্ধ থাকে, যেখানে অন্যের সাথে চাওয়া পাওয়ার কোনো লেনদেন নেই, যেখানে আমার কষ্টগুলোকে নিয়ে উৎসব করা যায় না, যেখানে আমাকে উপেক্ষা করার মতো কেউ নেই, যেখানে নিজেকেই প্রতিটা দিনের জন্য অভিনন্দন জানানো যায়, যেখানে নিজের আত্মসম্মানের জন্য গর্ববোধ হয়।

যতই থাকুক না কেন হতাশা, অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা, হিংসা বা গ্লানি – অন্যের ঈর্ষা হোক আমাদের জয়, অন্যের উপেক্ষা হোক আমাদের আত্মবিশ্বাস, আর সেখানেই বাঁচুক তোমার-আমার মতো মানুষের অচেনা কাহিনী, বাঁচুক আমাদের অহংকার-জেদ-একগুঁয়েমি, বাঁচুক আমাদের হেরে যাওয়া প্রেম-ভালোবাসা – সর্বোপরি বাঁচুক তোমার-আমার ব্যর্থতার সাফল্য। তাই জোর গলায় বলতে চাই,

বিশ্ব আমাদের চিনুক নতুন করে, থমকে যাক চারিপাশের লোক,
মনে প্রাণে চাইছি আমি, যেন আমাদের নিয়ে নতুন করে গল্প শুরু হোক।

Best Wishes

from

Nirmal, Sunanda Kundu & Family

Bijoya Greetings & Best Wishes from

Pratyay, Anuraag, Priya & Pallab

WWW.অন্তরাল.নেই

সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)

সেদিন বিকেলে দক্ষিণ কলকাতার চকগড়িয়ার পঞ্চানন চক্কোত্তি অফিস-ফেরত গড়িয়াহাটের আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ে একটু আধটু কেনাকাটা সেরে যেই না বাইরে বেরিয়েছেন, পকেটে বেজে উঠলো জনপ্রিয় বাংলা ব্যান্ডের জীবনমুখী গান। পাঞ্জাবীর ভেতরে মোবাইলের অস্থির কাঁপুনি। এমনিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দেশী রাজারাজড়া দের ওপর ব্রিটিশের চাপিয়ে দেওয়া সেই 'ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর দায়িত্বহীন ক্ষমতার' নীতি তাঁর বাড়িতেও বহাল মোবাইল ফোনের ব্যাপারে। রিংটোন, প্লাস্টিক জ্যাকেটের রং, ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবি -- সব ঠিক করার আর নিরন্তর গেম খেলে যাওয়ার জন্মগত অধিকার তাঁর নাতি নাতনীদের। তাঁর দায়িত্ব শুধু টাকা ফুরোলে টাকা ভরা, চার্জ ফুরোলে চার্জ দেওয়া। এমনও হয়েছে বার কয়েক যে, কোন ফাঁকে চুপিসাড়ে বিচ্ছু দুটো রিংটোন বদলে দিয়েছে, জানতেও পারেননি, তাই বাসের মধ্যে নিজের ব্যাগের সাইড-চেন থেকে শাহরুখ খানের লেটেস্ট হিট বাজছে শুনেও ভেবেছেন এ নির্ঘাত অন্য কারুর -- আমারটা তো শিলাজিতের "জলফড়িং"। যাই হোক, আজ পকেট থেকে ফোনটা বার করে কল রিসিভের বোতামটা টিপতেই ওপাশ থেকে মুখঝামটা। গিন্নীর।

"পই পই করে বললাম না বুল্টির বিয়ের নমস্কারী শাড়ি-জামা সব দক্ষিণাপন থেকে কেনা হবে? নাহলে সাউথ সিটি মল বা হাইল্যান্ড পার্ক মলের শ্রীনিকেতন থেকে? সর্দারি করে গড়িয়াহাট গেছো কোন আক্কেলে? হ্যাঁ?"

বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হবার জোগাড় পঞ্চাননের। কাকপক্ষীকেও তো জানাননি আজ ফেরার পথে শালীর ছোটমেয়ে বিয়ের কেনাকাটা করতে এমুখো হবেন ! গিন্নী জানলো কী করে? ম্যাজিক না দৈববাণী? নাকি চীনের রাজধানীর মতো এই শহরেরও প্রতিটি আনাচে কানাচে শ'য়ে শ'য়ে সিকিউরিটি ক্যামেরা বসানো আছে প্রত্যেকের প্রতিটি নড়াচড়ার ওপর নজর রাখতে? আমতা আমতা করে গিন্নীকে শুধোলেন,

---"তু-তুমি বুঝলে কি করে আমি কোথায়?"

---"ন্যাকামি হচ্ছে? একটু আগেই রিমলি-ঝিমলির সঙ্গে দেখা হয়নি তোমার?"

---"হয়েছিল তো। তাতে কী?" ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হয়না পঞ্চাননের কাছে। পাড়া'র প্রতিবেশী রণেনবাবুর স্ত্রী শ্যামলিকা ওরফে রিমলি আর তার কলেজে পড়া ফ্যাশনদুরস্ত বোন কুসুমিকা ওরফে ঝিমলি সামনেই ট্রেডার্স অ্যাসেম্বলি নামের দোকানটা থেকে হাতে কয়েকটা প্যাকেট ঝুলিয়ে এই দোকানে এসে ঢুকেছিলো মিনিট পনেরো-কুড়ি আগে। ওরা তো এখনো আদি ঢাকেশ্বরীর ভেতরেই রয়েছে। ওরা খবর দেবে কী করে?

---"ধ্যাত্তেরি! ঝিমলিই তো টেক্সট করলো রুমুকে -- তোমাকে দেখেছে শাড়ি বাছতে।"

ও হরি। এর মধ্যে টেক্সট মেসেজও পাঠানো হয়ে গেল? অবশ্য আশ্চর্য কিছু নয়। রুমু অর্থাৎ পঞ্চাননের সদ্য-গ্রাজুয়েট ছোটমেয়ে আর ঝিমলি গলায় গলায় বন্ধু। রাতদিন মোবাইল কানে ফিসফিস গল্প করেই চলেছে অথবা পুটুর পুটুর করে টেক্সটিং। এতো কী কথা থাকে আজকালকার ছেলেমেয়েদের? ভেবে পান না পঞ্চানন। ট্রামে বাসে রাস্তায় ঘাটে অফিসে বাজারে শপিং মলে যেদিকে তাকাও যখন তাকাও সবাই কোনো না কোনো অদৃশ্য পার্টনারের সঙ্গে বাক্যালাপে মশগুল। অনেক সময়ই বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সামনে কে আছে না আছে বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। এইতো সেদিন নাতিটা হাঁস-সন্দেশ খাওয়ার বায়না করল বলে পাড়ার গোবিন্দর মিষ্টির দোকানে গিয়েছিলেন। দোকানে ঢুকে দুটো হাঁস-সন্দেশ চাইতেই যে ফচকে ছোঁড়াটা কাউন্টারে ছিল, সোজা বলে দিলো "আজ হবেনা। কাল সকালে আসুন।"

---"সেকি ? ওই তো শোকেসে সাজানো আছে দেখতে পাচ্ছি।"

---"আরে যা বলছি করুন না। আপনার ভালোর জন্যই তো বলছি।"

---"ভালোর জন্য মানে? চ্যাংড়ামি হচ্ছে? গোবিন্দ, এই গোবিন্দ, আয় তো এদিকে একবার। দেখ তো কী সব উল্টোপাল্টা কথা বলছে --"

মালিকের নাম শুনেই ছোঁড়াটার সম্বিৎ ফিরেছে। এক গাল হেসে জিভ কেটে বলল, " না না দাদু, ওটা আপনাকে বলিনি, আমার বড়মামাকে। পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছে বুড়োর, তো আজই এক্ষুণি মধ্যমগ্রাম থেকে এখানে এসে পিয়ারলেস হাসপাতালে নাম লেখাতে চায়। এই ভর সন্ধ্যেবেলা ওসব হয়, বলুন?" তখন পঞ্চাননের খেয়াল হল ছেলেটার হেলানো ঘাড় আর কাঁধের মাঝে মোবাইল ধরা। কথা বলতে বলতে কাস্টমার সামলাচ্ছে। মাল্টিটাস্কিং!

এর তো তবু মোবাইলটা দৃশ্যমান। ইদানীং আবার আরেক শ্রেণীর লোক চোখে পড়ে যাদের হঠাৎ দেখলে মনে হবে নির্ঘাত কোনো মাথার ব্যামো আছে, নয়তো থিয়েটারের পার্ট আওড়াচ্ছে। হাতে ফোন-টোন কিছু নেই কিন্তু অনর্গল স্বগতোক্তি করে যাচ্ছে। মাস কয়েক আগে একদিন সকালবেলা অফিসের চার্টার্ড বাস ধরার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন, হঠাৎ দেখেন একটা ঢ্যাঙা চেহারার স্যুটেড-বুটেড লোক দুহাত কোটের পকেটে রেখে ইতস্ততঃ পায়চারী করছে আর নিজের মনে বিড়বিড় করে চলেছে। কৌতূহলী হয়ে কান পাততে দু-চারটে কথা শোনা গেলো। "আরে, সবকিছু কি অতোই সোজা? দেখছেন না কিরকম বাজার? ওসব এরিয়ায় জমি খোঁজা -- মিনিমাম দু-লাখ সত্তর হাজার।"

কে জানে, হয়তো জমি-বাড়ির ব্রোকার-টোকার গোছের কিছু হবে। ক্লায়েন্টের মুখোমুখি হবার আগে বাসস্ট্যান্ডেই ঝালিয়ে নিচ্ছে কী বলবে। নাকি অফিস বা ক্লাবের নাটক-ফাটকে চান্স পেয়েছে, তাই পার্ট মুখস্থ করছে? সে-জিনিস পঞ্চানন নিজেও এককালে বহু করেছেন। পোশাক ওরকম না হলে, মানে গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবী আর কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা থাকলে, হয়তো সন্দেহ করতেন লোকটা আপনভোলা কবি। ওর কথাগুলোর মধ্যে বেশ ছন্দমিল আছে। যাইহোক, সেদিন বাসে পাশের সিটে বসেছিল শুভজিৎ -- ইয়ং ছেলে, সল্ট লেকের সেক্টর ফাইভে চাকরি করে, আজকালকার ভাষায় যাকে বলে 'টেক-স্যাভি'। ওকে ব্যাপারটা বলতেই গোঁফ নাচিয়ে মুচকি হেসে বলল, "ওর বোধহয় blue tooth আছে মেসোমশাই, তাই ওরকম করে কথা বলছে।" নিজের অজ্ঞতা ঢাকতে আর কথা বাড়াননি পঞ্চানন, কিন্তু মনে মনে ভেবে কূল পান না -- blue tooth আবার

কী! কোনো দাঁতের রোগ-টোগ নাকি? মনে আছে অনেক বছর আগে যখন আক্কেল দাঁত উঠেছিল, যন্ত্রণায় রাতে ঘুম হতনা, রাত্তিরবেলা বারান্দায় অস্থির হয়ে পায়চারী করতে করতে বাবাগো-মাগো-পারিনাগো করতেন। নীল দাঁত হলে বুঝি মুখ দিয়ে কাতরানি না বেরিয়ে বিষয়-সম্পত্তির কথা বেরোয়? এই ঘটনার বেশ কিছুদিন বাদে এগারো ক্লাসে পড়া বড় নাতি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিল blue tooth আর হ্যান্ডস-ফ্রি ফোনের রহস্য।

মোবাইল ফোন জিনিসটা যদি শুধুই গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনে এরকম নিরীহ মজার উপাদান হতো, তাহলে সমস্যা ছিল না। কিন্তু এ অতি মারাত্মক জিনিস। এর স্টিল ক্যামেরা আর ভিডিও ক্যামেরার শ্যেনচক্ষু থেকে নিজেকে আড়াল করা শিবেরও অসাধ্য। পঞ্চাননের নিজের অফিসেরই লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক শ্যামাপদ হালদারের একবার কী হাল হয়েছিল, ভাবলে হাসিও পায়, আবার শিউরেও উঠতে হয়। লোকটা এমনিতে ভালো, আপাদমস্তক নিরীহ গোবেচারা টাইপ। শুধু একটাই বদঅভ্যেস -- রাস্তা-ঘাটে আড়ালে-আবডালে ছোট বাইরে যাওয়া। থাকে উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি পাড়ায় গলির গলি তস্য গলিতে। ওখানে ওভাবে হালকা হবার সুযোগ অনেক। কিন্তু গত বছর একদিন ছেলেকে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির এডমিশন কাউন্সেলিংয়ে দিয়ে ওখান থেকে বাস ধরে অফিসে আসার পথে ওই কান্ড করেছিল। আর করবি তো কর একেবারে একাউন্টস ডিভিশনের রঞ্জিত মুখুজ্জের বাড়ির লাগোয়া গলিতে! জানা ছিল না যে ওখানে অফিস কলিগের বাড়ি, জানলে কি আর --। বেচারার এমনই ভাগ্য যে ঠিক সেই সময়েই মুখুজ্জের ছোট ছেলেটা দোতলার জানলায় দাঁড়িয়েছিল ওর সদ্য-চাকরি-পাওয়া দাদার নতুন স্যামসুং গ্যালাক্সিটা হাতে নিয়ে। এমন মওকা কেউ ছাড়ে? সঙ্গে সঙ্গে খটাক। আর এরকম একটা স্ন্যাপ চেপে রাখা যায়? সোজা ফেসবুকে। সঙ্গে আবার ক্যাপশন "ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া"! ফেসবুক এমনিতেই তিল কে তাল করার জায়গা, আর এ তো একেবারে 'কট রেড হ্যান্ডেড'। একদম সামনে থেকে তোলা। অতএব 'বার্তা রটি গেল ক্রমে'। এর পরের কদিন হালদারকে ওর হাঁটুর বয়সী জুনিয়র ছোঁড়া গুলো যা নাজেহাল করেছিল, কহতব্য নয়। ক্যান্টিনে করিডোরে অফিস-ফ্লোরে পাশ দিয়ে গেলেই "কি দাদা, পেয়েছে নাকি?", "কি দাদা, আজ কোথায় হল? উত্তর না দক্ষিণ?" শুনতে শুনতে মেজাজ হারিয়ে গালাগাল করতো ও। তাতে তো আরোই পোয়াবারো।

মোটকথা এই ঘটনার পর পঞ্চাননও একটু বেশী সাবধান হয়েছেন। হালদারের রোগ ওঁর নেই, যেটা আছে সেটা এই বয়সে খুবই স্বাভাবিক। দুপুরে গিন্নীর গুছিয়ে দেওয়া টিফিনটা খেয়ে বিকেলের দিকে একটু ঝিমুনি আসে। সেরকম নাক ডাকিয়ে ভাতঘুম মোটেও না, নেহাতই ঝিমুনি। কিন্তু টেবিলে জমা ফাইলপত্তরের আড়াল থাকলেও কেউ কোনো দিন ওঁর অজান্তে টুক করে মোবাইলে ছবি তুলে "ম্যায় মুলাজিম হুঁ সরকারী" গোছের একটা মুখরোচক ক্যাপশন-সহ ফেসবুকে দিয়ে দিলেই কেস জন্ডিস। রিটায়ারমেন্টের মুখোমুখি এসে এরকম হেনস্থার কথা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। এমনিতে এই ফেসবুক জিনিসটার মাথামুন্ডু বোঝেননা তিনি, একাউন্ট খোলার তো প্রশ্নই নেই। কিন্তু লোকমুখে এর যা কীর্তিকলাপ শোনেন, তাতে গভীর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে ওটার ওপর। যখন ছোট ছিলেন, দেখতেন রোজ বেলা বারোটা নাগাদ পাড়ার বুড়ি মানুষরা রান্নাবান্না চানটান ঠাকুরপুজো সেরে ওঁদের পুরোনো বাড়ির লাল সিমেন্টের রকে জমায়েত হতেন। ওঁর ঠাকুমা ছিলেন সেই দ্বিপ্রাহরিক আড্ডার মধ্যমণি। ফোকলা দাঁতে মুড়ি-বাতাসা বা চিঁড়ে-গুড় চিবোতে চিবোতে জগৎ সংসারের এমন বিষয় নেই যা নিয়ে আলোচনা করত না সেই বুড়ির দল। অমুক বাড়ির মেজো ছেলে ভিন্নজাতে বিয়ে করেছে বলে তাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করা হবে, তমুকের মেয়ের বিয়েতে পাত্রপক্ষ এক কানাকড়িও পণ চায়নি, অমুকের ননদেরা দিনরাত উঠতে-বসতে খোঁটা দেয়, তমুকের বৌটা এতো দজ্জাল যে শাশুড়িকে তিনমাসে বাড়িছাড়া হতে হয়েছে -- এইরকম আরো কত কী। সিংহভাগই পরনিন্দা-পরচর্চা। তবে ধর্মকর্ম আর রান্নাবান্নার কথাও হতো অনেক। আরো একটা জিনিস হতো মাঝেমধ্যে -- আত্মগরিমা প্রচারের প্রতিযোগিতা। আমার ছেলে হেড-আপিসের বড়বাবু হয়েছে তার বিরাট হাঁকডাক, আমার নাতি 'ম্যাট্রিকে' এতো ভাল পাশ করেছে যে ওর 'ম্যাস্টররা' বলেছে এ-ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে, আমার নাতনীর এমন বনেদী ঘরে বিয়ে হয়েছে যে বাপের বাড়িতে বেড়াতে এলেও ঠাকুর-চাকর সঙ্গে নিয়ে আসে -- ইত্যাদি। এসব বহু যুগ আগের কথা। কিন্তু আধুনিক যুগের এই ফেসবুক-নামক সর্বজনীন আড্ডাখানায় যা হয় বলে শুনেছেন, সেটা কি এর থেকে খুব আলাদা? খোলাখুলি পরনিন্দা-পরচর্চা হয়তো হয়না, কিন্তু চোরাগোপ্তা বা ঠারেঠোরে তো চলতেই থাকে। যুগের সঙ্গে তাল রেখে আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধিও বিশাল -- আহার-বিহার-বিনোদন-প্রসাধন-আবরণ-আভরণ-ফ্যাশন-প্যাশন কিছুই বাদ নেই। আর আত্ম প্রচার? ওরেব্বাবা ! "কাল মুম্বাই হয়ে গোয়ায় পৌঁছেছি। বর্ষায় গোয়ার বীচগুলো কী রোমান্টিক !" (সঙ্গে ছবি)। "ওমা, কী বিউটিফুল ! আমরাও না এখন হানিমুনে কাংড়া ভ্যালীতে। লাহুল-স্পিতি সিম্পলি এক্সকুইসিট।" (সঙ্গে আরো ছবি)। "ইস কী মজা করছিস রে তোরা ! কিন্তু কলকাতার পুজোটাই তো মিস করলি। আমরা তাই আন্দামান থেকে ভাইজ্যাগ হয়ে ষষ্ঠীর আগেই ফিরে এসেছি।" (সঙ্গে গোটা একটা পিকাসা অ্যালবামের লিংক)। "ওরে নাঃ, জনগণ কী মস্তি মারছে ! ওয়েটিং ফর মাই টার্ন। লক্ষ্মীপুজোর দিনই ব্যাংকক ফ্লাই করছি আমরা --"। এরকম চলতে থাকবে, চলতেই থাকবে, ক্রমশঃ বড় হতে থাকা স্নো-বলের মতো। আচ্ছা, এসবে ক্লান্তি আসেনা মানুষের? আসেনা বোধহয়। নাহলে কি আর মুখেভাত হবার আগেই আজকালকার শিশুদের 'মুখেবই' (মানে ফেসবুক একাউন্ট খোলা) হয়ে যায়? তবে নাতি নাতনীদের একটা ব্যাপার জেনে খুব মজা পেয়েছিলেন পঞ্চানন। ওই 'লাইক' করার ব্যাপারটা। চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল "হীরক রাজার দেশে"তে রাতের "ঠিক কিনা?" -- এই প্রশ্নের উত্তরে চাটুকার দের "ঠিক", "ঠিক", "ঠিক"। অথবা ছোটবেলায় ঠাকুমার দ্বিপ্রাহরিক রকের আড্ডায় শোনা "খাঁটি কথা কয়েছ চাটুজ্জে-গিন্নী", "এক্কেরে হক কথা গো বামুনদিদি" ইত্যাদি। পুরোনো জিনিস কেমন নতুন মোড়কে ফিরে ফিরে আসে।

কিন্তু একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর। ওই যে 'ট্যুইটার' না কী যেন। ছোটবেলায় মফস্বলের বাড়িতে ভোরবেলায় পাখির কুহু-কাকলিতে ঘুম ভাঙত। তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন এই 'পাখির ডাক' কালের ফেরে বিশ্বায়িত, জনগনায়িত হয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দেবে? খবরের কাগজে খেলার পাতা আর বিনোদনের পাতার আদ্ধেক জুড়ে সেলিব্রিটিদের ট্যুইট। আই পি এল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে কেউ হয়তো পরপর তিনটে ছক্কা মারল, সঙ্গে সঙ্গে বলিউডের কোনো মহারথীর হাত নিশপিশ করে উঠল, ট্যুইটারে মেসেজ গেলো "কেয়াবাত! কেয়াবাত! চালিয়ে যাও গুরু, দুরমুশ করে দাও।" যা দেখে সেই হিরোর লেটেস্ট ছবির হিরোইন আর চুপ করে থাকতে না পেরে "বেশি বাতেলা করোনা ডার্লিং, ঘরের মাঠে সবাই রাজা। আসুক না আমাদের এখানে, দেখ লেঙ্গে !" ব্যস, মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল চেন রিঅ্যাকশন। আর 'পাবলিক' নামক সর্বভুক পেটুকটি তো আছেই এসব গোগ্রাসে গেলার জন্য। মিডিয়াও সেরকম -- রাস্তার ধুলোবালিরও যদি মার্কেট ভ্যালু থাকে তাই তুলে এনে ডিশে সাজিয়ে যত্ন করে পরিবেশন করবে কাঁটাচামচ সহকারে। যাইহোক, সেলিব্রিটিদের 'কাকলি-কূজন' নিয়ে আদেখলেপনা নাহয় তাও মানা গেল। কারণ হাজার হলেও তেনারা তারকা, তাঁদের স্টারডাস্ট পেয়ে আমজনতার জীবন ধন্য হয়। রবিঠাকুর বলে গেছেন না,"শুধু তোমার বাণী নয়গো হে বন্ধু হে প্রিয়, মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও"? তো ওই তারকারাও শুধু রূপালি পর্দায় তেনাদের অমর বাণী (যথা "যো ডর গ্যায়ে সমঝো মোর গ্যায়ে", "আব তেরা

কেয়া হোগা কালিয়া?", "মোগাম্বো খুশ হুয়া", "পিকচার আভিভি বাকি হ্যায় দোস্ত", ইত্যাদি) বর্ষণ না করে মাঝে মাঝে ট্যুইটারে জনতার প্রাণে ক্ষণিকের পরশ দিয়ে যান। কিন্তু আমজনতা যখন ট্যুইট করে -- নিজেদের মধ্যে? সে এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতা। সকালে হয়তো আপনি চা-টা খেয়ে আরাম করে খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছেন, কারো কাছ থেকে ট্যুইট এলো "এইমাত্র বাজার করে ফিরলাম"। তা ফিরলি তো ফিরলি, আমার তাতে কী? আমি কি জানতে চেয়েছি? অতঃপর ট্যুইট, "বাজারে আজ পদ্মার ইলিশ বারোশো টাকা। কিনে আনলাম। " কিনেছিস বেশ করেছিস! পকেটে মাল্লু আছে, চুটিয়ে বাবুগিরি করেছিস, তা নিয়ে ঢ্যাঁড়া পেটানোর কী আছে? সঙ্গে সঙ্গে আবার ট্যুইট, "এখন বাথরুমে ঢুকব।" মহা মুশকিল তো! এরপর বাথরুমে ঢুকে কী করছিস সেটাও কি ট্যুইট করবি? আসলে বাস্তবে যারা নক্ষত্র জগতের বাসিন্দা হতে পারেনি, তারা এইভাবে নিজেদের নক্ষত্র কল্পনা করতে ভালোবাসে -- যেন তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি নড়াচড়া ক্যামেরাবন্দী হয়ে সিনেমা হবে। ট্যুইটগুলো যাদের পাঠানো হচ্ছে তাদের কেমন লাগতে পারে -- সেসব ভাবার কোনো প্রশ্নই নেই। মাঝখান থেকে এই ট্যুইটারের নেশায় পঞ্চাননের নাতি নাতনীর প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ইংরেজী বানান ভুলে যাচ্ছে। ওখানে তো ভাওয়েল-টাওয়েলের বালাই নেই, শব্দের মাঝখানে হঠাৎই সিলেবেল উধাও হয়ে গিয়ে বসে পড়ে সংখ্যা বা বিচিত্র সব চিহ্ন। যেমন বৌমার অনুরোধে একদিন ছোটনাতিকে ইংরেজী ডিকটেশন দিচ্ছিলেন, দেখলেন ছেলেটা তাতে লিখেছে "ILL O8 4 U"। অর্থাৎ কিনা "আই উইল ওয়েট ফর ইউ"। EDUCATION-এর "I" টা বেমালুম বাদ। বলতে গেলে আবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিল্মস্টারি কায়দায় বলবে "ইটস নট ইম্পরট্যান্ট"। হ্যাঁ, সে তো একশোবার -- ট্যুইটারের চেয়ে ইম্পরট্যান্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু আছে নাকি?

যদি থাকে, তার নাম ইউটিউব। বিজ্ঞানীরা যে বলেন একজন মানুষের বংশগতি, চেহারা, জৈবিক প্রবৃত্তি, মানসিক গঠন এই সমস্ত কিছুর হদিশ পাওয়া যায় তার জেনেটিক কোড থেকে -- ভুল বলেন। আজকাল একজন মানুষের আসল পরিচয় জানা যায় তার ইউটিউব 'ফুটপ্রিন্ট' থেকে। তার জন্মের পরের প্রথম কান্না, অন্নপ্রাশনের প্রথম ভাত খাওয়া, হাতেখড়ির প্রথম অক্ষর, জন্মদিনের পার্টি, পৈতের অনুষ্ঠান, গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি, বিয়ের গায়েহলুদ, হানিমুন ট্রিপ, সন্তান জন্মানো -- সমস্তকিছু ভিডিও ফুটেজ-রূপে ইউটিউবে গচ্ছিত থাকে। যেন ইউনিভার্সাল ব্যাংকের সেফ ডিপোজিট। কেউ চাইলেই 'ক্যাশ উইথড্র' করে টাটকা টাটকা দেখিয়ে দাও। পঞ্চাননের এখন মনে পড়লে হাসি পায়, প্রথম যখন ইউটিউবের নাম শুনেছিলেন নাতনীর কাছে, ছোট্ট মেয়েটা লাফাতে লাফাতে এসে যখন বলেছিল "দাদু, আমার ইউটিউব দেখেছো? আমার ইউটিউব দেখেছো?", ঠিক বুঝতে পারেননি কিসের কথা জিজ্ঞেস করছে। ভেবেছিলেন হয়তো টুথপেস্ট বা গঁদের আঠার টিউব-ফিউব হারিয়ে ফেলেছে। বলেছিলেন ওর মায়ের ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারগুলো ভালো করে খুঁজে দেখতে। শুনে সেই একরত্তি মেয়ের কী খিলখিল হাসি ! যাইহোক, এই ইউটিউব জিনিসটা যদি ওঁর ছোটবেলায় থাকতো, বেচারা বড়দা-টার আঙ্গুলগুলো বেঁচে যেত। পঞ্চাননের বড়দা আসলে স্কুলে পড়ার সময় মফস্বলের এক অখ্যাত গুরুর কাছে তবলা শিখতেন। সেই গুরুর কাছে মাঝেমধ্যেই বিখ্যাত তবলচিদের আসাযাওয়া ছিল. তাঁদের কেউ আল্লারাখার শিষ্য, কেউ বা উস্তাদ আলম খানের। হয়তো কোনো দিন গুরুর কাছে বড়দা সবে ঘন্টাতিনেক প্র্যাক্টিস করে উঠেছেন, আঙ্গুলগুলো টনটন করছে। ঠিক সেই সময় হাজির ঐরকম কোনো এক মহাগুরু। ছাত্রের পরিচয় পেয়েই তার পিঠ চাপড়ে "সাব্বাশ বেটা, দিখা তো জরা কেয়া শিখা"। ব্যস, আবার বাবু হয়ে বসে ধা-ধিন-ধিন-ধা না-তিন-তিন-তা -- যতক্ষণ না থামার অনুমতি মিলছে। আজকালকার ছেলে হলে হয়তো স্রেফ বলে দিত, "স্যার, আপনার ইমেল এড্রেসটা দিয়ে দিন, ইউটিউবের লিংকটা ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি -- ওতেই আমার সব রিসাইটাল পার্ফর্মেন্সগুলো আছে, দেখে নেবেন।"

অবশ্য এতকিছুর মধ্যে পঞ্চানন এই খবরও রাখেন যে এহেন ফেসবুক-ট্যুইটার-ইউটিউবের কল্যাণেই আট বছর আগে আরব দুনিয়ায় গণবিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছিল দাবানলের মতো। দেশের পর দেশে যদি উল্টেছিলো একনায়কদের। একেই বলে e-গণতন্ত্র। আরো একটা চমকপ্রদ খবর শুনেছিলেন পাড়ার ভবতোষবাবুর বছর-দুয়েক আমেরিকায় কাটিয়ে আসা ছেলের কাছে। নিউইয়র্কে না কোথায় কোন এক প্রেক্ষাগৃহে ট্যুইটারপ্রেমী দর্শকদের জন্য আলাদা করে কিছু আসন নির্দিষ্ট করা থাকে, যেখানে বসে থিয়েটার চলাকালীনই তাঁরা ট্যুইট করে অভিনয় বা অভিনেতা সম্বন্ধে মতামত জানাতে পারেন। শুধু তাই নয়, সেই মন্তব্য অনুসারে দর্শকদের চাহিদা বুঝে তৎক্ষণাৎ বদলে যেতে পারে নাটকের গতিবিধিও। অর্থাৎ ইন্টারএক্টিভ হিস্ট্রিওনিক্স। শুনে ভাবছিলেন পঞ্চানন, এটা সেই শিশির ভাদুড়ী-অহীন্দ্র চৌধুরী-মহেন্দ্র গুপ্তর বা শম্ভু মিত্র-অজিতেশ বাঁড়ুজ্জের যুগে হলে ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়াতো? হয়তো কোনো দুঃখের সিনে শিশিরবাবু আবেগ মথিত গলায় বলছেন "আমার সাজানো বাগান তছনছ হয়ে গেল"। দর্শকাসনে থেকে চোখের জল ধরে রাখতে না পেরে কিছু দর্শক ট্যুইট করল, দুঃখের একটু ওভারডোজ হয়ে যাচ্ছে। মেসেজ পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে শিশিরবাবু সামলে নিলেন, "না না, মানে তছনছ হতে যাচ্ছিল, কিন্তু এখনো হয়নি -- আশা আছে"।

এইসব সাত-পাঁচ সত্তর-পঁচাত্তর ভাবতে ভাবতে প্রথমে অটো তারপর বাসে করে বাড়ি পৌঁছে গেলেন পঞ্চানন। হাতে তখনও আদি ঢাকেশ্বরীর প্যাকেটগুলো ধরা। গিন্নীর হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও ভাবলেন একবার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চোখের দেখা দেখাবেন সবাইকে জিনিস গুলো -- হয়তো পছন্দ হতেও পারে। জুতো-টুতো খুলে ঘরে ঢুকতেই ছোটনাতি কোথা থেকে বোঁ করে দৌড়ে এসে সুর করে বলতে লাগল, "দা-আ-দু, দা-আ-দু, তুমি ধরা পড়ে গেছ, ঠাম্মাকে বলে দেব, বলে দেব।" তটস্থ হয়ে ভাবেন, আবার কী করলাম রে বাবা ! মুখে বললেন, "যা যা, মেলা বকিসনি তো। সামনে উইকলি টেস্ট না? এখন খেলে বেড়াচ্ছিস যে বড়? বলবো মাকে?" একটুও না দমে বাচ্চাটা প্যান্টের পকেট থেকে ফটাস করে বার করলো তার কলেজে পড়া জ্যাঠতুতো দাদার নতুন ব্লাকবেরীটা, কী সব টেপাটেপি করে চোখের সামনে মেলে ধরল জলজ্যান্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ। তিনতলার চিলেকোঠার ছাদে একা পঞ্চানন -- হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। বিচ্ছুর দল কোন ফাঁকে ক্যামেরাবন্দী করে ফেলেছে। হাই ব্লাডপ্রেসার আর হার্টের রুগী পঞ্চাননের যে ও-জিনিস একেবারে বারণ। এখন কী করে সামাল দেওয়া যায়?

হে ঈশ্বর! কী বিচিত্র তোমার লীলা। নিজের বাড়িতে নিজের চিলেকোঠার ঘরে নিজের একান্ত নিভৃত মুহূর্তে নিজের লুকোনো প্যাকেটের সিগারেট -- তারও কি একটুখানি অন্তরালের অধিকার নেই? বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ, কেমনে দিই ফাঁকি?

করোনাভাইরাস / টাচফোন (অনুনাটিকা)

রাজু দাস

মদন : (ফোনে ডায়াল করার পরে) ওহে মন্টু আমি মদনদা বলছিরে। এই লকডাউনের মধ্যে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কে কেমন আছেন তার খোঁজ খবর নিতে গিয়ে তোর কথা মনে পড়লো। অন্য সময় অফিসের ব্যস্ততার জন্য ফোন করা হতো না। তা তোরা কেমন আছিস বল ?

মন্টু : আর বোলোনা মদনদা, আমি একদম ভালো নেই গো। (কান্না)

মদন : কেন কি হয়েছে ! কাঁদছিস কেন?

মন্টু : আমি এখন স্টেজ থ্রি তে আছি গো মদনদা।

মদন : তা কি করে হবে ! আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ বলছেন, ভারত এখনো স্টেজ টু তে আছে। জনতা লকডাউন না মানলে সহজেই স্টেজ থ্রি তে পৌঁছে যাবে।

মন্টু : সে কথা ঠিক। তবে শোনো, আমি স্টেজ ওয়ানে, ঘুম থেকে উঠে ঘর মুছে, থালা বাসন মেজে, ব্রেকফাস্ট তৈরী করে গিন্নিকে বেডটি দিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছি। স্টেজ টু তে, আমাদের দুজনের জামা প্যান্ট শাড়ি ব্লাউজ কেচে দুপুরের খাবার বানিয়েছি। আমার মিসেস শিপ্রা স্মার্টলি স্মার্টফোনে টাচ করে সময় কাটিয়েছেন।

মদন : বলিস কি !

মন্টু : এবার স্টেজ থ্রি র কথা শোনো, বিকেলে মুড়ি পিঁয়াজী, রাতে চিকেন কারি আর পরোটা বানিয়ে একটু ছাদে এসে আকাশ দেখছিলাম। জানো দাদা এ যাত্রায় কোভিড নাইনটিনের হাত থেকে বাঁচলেও শিপ্রার হাত থেকে মুক্তি পাবো বলে মনে হয় না।

মদন : এখন দ্যাখ্ কেমন লাগে। বিয়ের আগে পইপই করে বলেছিলাম - মন্টে মোটা টাকা পণের বিনিময়ে ঐ মোটা পাত্রীকে বিয়ে করিস নে। এবার ঠ্যালা সামলা।

মন্টু : তখন কি জানতাম, করোনার প্রকোপে এতদিন ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে হবে। ছেলে মেয়ে দুজনেই বিদেশে আটকে পড়বে। ঝি চাকররাও আসবে না।

মদন : তা ঠিক। দেখিস লকডাউন উঠে গেলেই অদৃশ্য করোনা ভাইরাসের মূর্তি পুজোর ধুম লেগে যাবে ভারতে।

মন্টু : তা যা বলেছো। এবার তোমাদের খবর বলো মদনদা, ভালো আছো তো?

মদন : ফার্স্টক্লাস। তুই তো জানিস আমাদের লাভ ম্যারেজ।

মন্টু : সে তো জানি। বিয়ের আগে পাক্কা তিন বছর প্রেম চালিয়েছো তোমরা। রমা বৌদিকে ফোনটা দাও একটু কথা বলি।

মদন : ওকে এখন ডিসটার্ব করা যাবে না। পাশের ঘরে বসে টিভি তে মিরাক্কেল দেখছে।

মন্টু : তাহলে তুমিই বলো সময় কাটাচ্ছো কি ভাবে। তুমি যা আড্ডাবাজ মানুষ।

মদন : (ফিসফিস করে) তোকে একখান কথা বলতে পারি যদি আর কাউকে বলবি না কথা দিস ?

মন্টু : বলবো না। প্রমিস -

মদন : আমিও লকডাউনের পর থেকে ভালো নেইরে মন্টু। প্রত্যেকদিন তোর বৌদির হাতে রুটিবেলুনির পেটাই খাচ্ছি পিঠে (কাঁদে)

মন্টু : সে কি কেন কেন ?

মদন : আর বলিস না, রমার দু তিনজন বন্ধু নাকি ফেসবুকে দেখেছে তাদের স্বামীরা সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করছে এবং বৌরা টি ভি দেখছে। ঘুমোচ্ছে।

মন্টু : বেশ তো প্রতিদিন বেলুনির মার না খেয়ে তুমিও রান্নাবান্নার কাজ করা শুরু করো।

মদন : না রে মন্টে, আমি তোর মতো অতো বোকা নই। তুই তো জানিস না বিয়ের পর থেকে গিন্নির গালমন্দ শুনে শুনে যেমন বোবা হয়ে থেকেছি। এখন লকডাউনের ক'টাদিন তেমনি মার খেয়ে থাকবো। যাতে ভবিষ্যতে আমাকে গৃহকর্ম না করতে হয় হা: হা :

মন্টু : হা: হা: তোমার বুদ্ধিকে নীল সেলাম।

মদন : ভাইরে, সেবাকর্মী ও বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় অসংখ্য মানুষের মৃত্যুমিছিল একদিন থেমে যাবেই কিন্তু ঘর সংসারের কাজ তো কোনদিন থামবে না।

মন্টু : সে না হয় হলো, তুমি মাস্ক পরে বাজারে যাচ্ছো তো ?

মদন : তুই তো জানিস বাজারে গিয়ে চা খেতে খেতে বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে, বাজার করে যতটা আনন্দ উপভোগ করি তার চাইতে বেশি গিন্নির গালমন্দ হজম করি ঘরে এসে অখাদ্য বাজার করেছি বলে। তবুও বাজারে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কাল থেকে আর যাওয়া হবে না।

মন্টু : কেন কেন ?

মদন : আজকে সকালে গিন্নি বললে দিনের মধ্যে চোদ্দবার হাত ধোবার ফলে সাবান শেষ। চাল ডাল তেল মশলা বাড়ন্ত। হাতে থলি মুখে মাস্ক লাগিয়ে বাজারে যাও। গেলাম। মুখে মাস্ক পরা পুলিশ বললে - ঘরে যাও। আমি বললাম - " থাকবোনা কো বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগতটাকে " লাঠি উচিয়ে পুলিশ বললে - ক্যালাবো তোমাকে উল্টো করে, পাল্টে দেবো থোবড়াটাকে। যাও ঘরে যাও।

(ইতিমধ্যে চুপচাপ রমা পেছনে এসে ফোনের কথাবার্তা শুনছিলো)

রমা : শোনো দাসবাবু, কাল থেকে যতদিন না লকডাউন উঠছে তোমাকে আর বাজারে অথবা দোকানে যেতে হবে না। প্রয়োজনে বিনে পয়সায় একমাসে রেশনে দুই জনের কার্ডে যে চার কেজি চাল ও চার কেজি গম পেয়েছি তাই লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে খেয়ে আমরা করোনা ভাইরাসকে রুখবোই রুখবো।

মদন : রুখবোই রুখবো (মুষ্টিবদ্ধ ফোন সহ হাত উপরে তুলতেই রমা ছোঁ মেরে টাচফোনটা কেড়ে নেবে)

রমা : এখন থেকে তোমার ফোনটা আমার কাছেই থাকবে।

মদন : একি তুমি ফিজিক্যাল ডিসট্যান্স ব্রেক করে, সাবান দিয়ে হাত না ধুয়ে ফোনটা নিয়ে নিলে, আমার সময় কাটবে কি করে?

রমা : (মৃদু হেসে) কেন ! আমি যেমন সারাদিন রেডিওতে নানাবিধ অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে ঘরের কাজকর্ম করে সময় কাটাই। তুমিও তেমনি কাটাবে।

মদন : ঐ টাচফোনটাতে স্পর্শ না করতে না পারলে আমি যে পাগল হয়ে যাবো রমা।

রমা : জানি জানি ঐ ফোনটাই এখন তোমার সর্বক্ষণের সাথী প্রিয়তমা। আর আমি হলাম গুড ফর নাথিং।

মদন : রমা আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, কাল থেকে ঘরের সমস্ত কাজ দুজনে মিলেমিশে করবো।

রমা : সে ঠিক আছে। আগে এই টাচফোনে খুঁজে খুজে দেখে নিই এর মধ্যে কি এমন আছে যা আমার মধ্যে নেই।

মদন : লকডাউন উঠে গেলেই তোমাকে একটা টাচ ফোন কিনে দেবো রমু।

রমা : (হেসে) শোনো মদনমোহন, তুমি বুনো ওল হলেও আমি কিন্তু বাঘা তেঁতুল। একথা মনে রেখো হি: হি: হি:

মদন : লক্ষ্মীটি ফোনটা দাও (কেড়ে নিতে যায়)

রমা : স্ট্যাচু। ডোন্ট টাচ মি। তিনফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখো। নইলে অবধারিত কোভিড নাইনটিন।

মদন : অ্যা : (দুজনে স্ট্যাচু)

**********৮

মূল নাট্যসূত্র : জাহাঙ্গীর হোসেন।

২৩শে এপ্রিল ২০২০

ফেসবুকে টেলিড্রামাতে যারা অভিনয় করছেন : -

মন্টু : পায়েল চক্রবর্তী

রমা : নমিতা দাস

মদন : রাজু দাস

পরিবেশক : শান্তিকুঞ্জ নাটুকে দল।

ছায়াছবির চিত্রায়ন : নমিতা দাস।

মানবিক মূল্যবোধ

নমিতা দাস (কলকাতা)

আমার নাট্য পাগল স্বামীর মুখে বহুবার শুনেছি একটি নাম। যে ছিল গ্রাম্যজীবনের সর্বক্ষণের সহচর, দু:সম্পর্কের নাতি অনন্ত চৌধুরী। সেই অনন্ত বারো ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে এক বেলার জন্য এসেছিল আমাদের শান্তিকুঞ্জে। সেও বত্রিশ বছর আগে। বছর খানেক আগে বাঘডোবা গ্রামে আমার মেজ ননদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল অনন্তর বাইশ বছরের সৌমদর্শন পুত্র অরূপের সাথে। যে গত তিন বছর রাশিয়ার কোন একটি মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ছে। ওর মুখেই জানতে পারলাম ওর বাবা ছত্রিশগড়ের কোন একটি গ্রাম্য বাজারে ডাক্তারী করছেন। সেদিন সঙ্গে সঙ্গে অরূপ ফোনে ওর বাবাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। অনেক গল্পগাথা, স্মৃতিচারণের পরে ওকে কথা দিতে হয়েছিল - আমরা অবশ্যই যাবো ছত্রিশগড়ে ওদের বাড়িতে। অগত্যা অনন্তর আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে চড়ে বসেছিলাম হাওড়া - মুম্বাই মেলে। শক্তি স্টেশনে সকাল সাতটায় ট্রেন থেকে নামতেই অনন্ত প্রনাম করে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরলো। আমি বললাম - এতো বছর পরে আমাদের কি করে চিনলে অনন্ত?

অনন্ত একগাল হেসে বললে - দিদা তোমাদের চুল দাড়ি পাকলেও দাদুর বিশাল নাকটি তো আর ছোট হয়ে যায় নি! চলো আমার চার-চাকা গাড়িতে যেতে যেতে কথা বলা যাবে। ত্রিশ কিলোমিটার পথতো আর চুপচাপ যাওয়া যাবে না। তাছাড়া এতো বছরের কত কথা কত স্মৃতি জমে আছে বুকের মাঝখানে। বলো দাদু!
তুমি ডাক্তারি পাশ কোন্ কলেজ থেকে করেছো?
- কৃষ্ণনগর আর্য়ুবেদিক কলেজ থেকে।
পাশ করার পরে কিছুদিন বিলাসপুরের কাছে একটি গ্রামে প্র্যাকটিস করতাম। সেখানেই সোমার সাথে পরিচয়। ভালো লাগা, তারপর বিয়ে। ওখানে শহর কাছে তাই চিকিৎসা জমছিল না। একদিন চলে এলাম এই অজ পাড়াগাঁয়ে।
আমি বললাম -আমরা এ সব কিছুই জানতাম না।
- জানেন দিদা, আমার দাদু মানে ডাক্তার হরিনাথ মন্ডলকে দেখেই ছোটবেলা থেকে মনে ইচ্ছে জেগেছিল , আমিও ডাক্তার হয়ে গরীবদের চিকিৎসা করবো। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সামর্থতো আমাদের ছিল না। দু'বেলা ভালোমন্দ খাবারই জুটতো না।

দাস বাবু বললেন - নমিতা তোমাদের দারিদ্র্য না দেখলেও আমি তো দেখেছি।
অনন্ত গাড়িটার স্পিড একটু কমিয়ে বললে - আমি তোমার কাছেও ঋনী দাদু।
- আমি তো তোমার কোন উপকার করতে পারিনি ! মা ছোট বোন মঞ্জুকে নিয়ে তখন আমরাই উদ্বাস্তু হয়ে জামাইবাবু ডা: হরিনাথ মন্ডলের ঘাড়ে চেপেছিলাম।
- এর কিছুদিন পরে তুমি নাটকের দল গড়ে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পটভূমিকায় নিজের লেখা "শপথ নিলাম" নাটক করেছিলে নাজিরপুর বাজারে। সে নাটকে আমাকে দিয়ে লতিফের চরিত্রে অভিনয় করিয়েছিলে। মনে পড়ছে?
- মনে ছিল না। এখন মনে পড়ছে। সেতো ১৯৭২ সালের কথা। সবে স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে।
- তার পরে তোমরা কলকাতা চলে গেলে। আমি কিন্তু নাটকের দলটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম অনেক বছর। আমিই মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতাম।
তাহলে তুমি আমার নাট্যগুরু হলে কি না !
- আচ্ছা এখানে NRC/CAA এবং করোনা ভাইরাস নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বা আতঙ্ক কতটুকু?
- এতটুকুও নয়। এ অঞ্চলে তো উদ্বাস্তু মানুষের কলোনী নেই। আদিবাসীরা অনাদিকাল থেকে এখানে বসবাস করছেন। এখানকার লোকেরা জীবনের জন্যই বাঁচে। বিলাসিতার জন্য বাঁচে না। শহরের প্রচার এখানে তেমন আঁচড় কাটতে পারেনা। তাছাড়া রায়পুরের মানাক্যাম্প ভিন্ন ছত্রিশগড়ে আর কোথাও বাঙালি উদ্বাস্তু কলোনী আছে কি না তা আমার জানা নেই।
- তা হলে কি রাজনৈতিক সচেতনতাবোধও নেই কৃষকদের ?
- কিছুটা আছে বলেই গত তিন বছরে যখন বি জে পি সরকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও কৃষকদের কোনো উন্নয়ন করেনি তখনই ভোটের মাধ্যমে কংগ্রেসকে ফিরিয়ে আনলো।

স্টেশন থেকে অনেকটা মসৃনপথ পেরিয়ে গ্রামের কাঁচা রাস্তায় হেলতে দুলতে গায়ে গায়ে লেপটে থাকা ঘন বসতি পূর্ণ মাটির দেওয়াল এবং খোলার (টালি) ছাউনির বস্তির মধ্যে দিয়ে, কখনো বা একফসলি অনাবাদী ধানী জমির বুক চিড়ে, গোটা তিনেক ড: আম্বেদকরের স্ট্যাচুতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এক সময় পাকা রাস্তার পাশে কাচন্দা বাজারে একটা বিশাল উঠোনে এসে দাঁড়ালো গাড়িটা।

সারি সারি কয়েকটি ঘরের মাথায় টিনের ছাউনি। দেয়াল পাকা। একপাশে ছোট্ট শিব মন্দির। অন্যপাশে ঔষধের বেশ বড় দোকান। গাড়ির গেট খুলে নামতেই একগাল হেসে নাতবৌ সোমা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো কতদিনের চেনা আপনজনের মতো। তাই দেখে আমার দাস মশাই উচ্চস্বরে বলে উঠলেন - শোন নাতবৌ, এরপরে আমাকে কিন্তু ভুলেও কখনো জড়িয়ে ধরো না। কারণ তোমার মতো যৌবনবতীর সাথে আলিঙ্গনের দৃশ্য তোমাদের দিদা দেখলে আমাদের তেতাল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটবেই।

হাসিমুখে সোমা জবাব দিল - আমার বয়েই গেছে, আমার হিরোর মতো দেখতে কচি বর থাকতে তোমাকে বুকে জড়াতে যাবো কোন্ দু:খে !
দাদু, এতো বছর পরে শেষ পযর্ন্ত তোমরা এলে। কি যে আনন্দ হচ্ছে আমাদের। আমি বললাম - এতো বছরে একবার অন্তত তোমরাও তো যেতে পারতে আমাদের বাড়িতে।

অনন্ত তিনটি লাগেজ নামিয়ে ঘরে রেখে এসে বললে- দিদা তোমরা ক'দিন এখানে থাকলেই বুঝতে পারবে, কেন আমরা একদিনের জন্যেও কোথাও বেরোতে পারিনা।

সোমা অনন্তর কথার পরে কথা জোড়ে - আমার সরকারি চাকুরী, রিম্পির পড়াশুনার চাপ, টিয়া পাখিটার একাকিত্ব। আর সবচেয়ে বড় বাধা হলো এখানকার দিন দরিদ্র আদিবাসী রোগীরা।

ওদের মিষ্টি মেয়ে রিম্পি একরাশ খোলাচুলে এসে পায়ে হাত দিয়ে আমাদের প্রণাম করে বললে - কি গো মা, দিদা দাদুকে ঘরে বসিয়ে গল্প করো না। জানোতো দিদা আমার ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা, দিদা দাদু কেউ নেই তাই আমিও তোমাদের দিদা দাদু বলেই ডাকবো। চলো ঘরে চলো।

ঘরের দরজা পেরোতেই দেখি, ডাক্তার টেবিলের তিনপাশের বেঞ্চিতে বসে আছে জনা দশেক শীর্ণকায় স্বল্পদামি পোশাকের জনজাতির নারী পুরুষ। ওদের মধ্যে উদোম গায়ে শিশুরাও আছে।

আমাদের পরে অনন্ত ঢুকতেই ওরা একসাথে কপালে দুইহাত ঠেকিয়ে বলে উঠলো - নমস্তে মহারাজ ডাক্তারসাব।

কৌতূহল বশত অন্দর দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম বেশ কিছুটা সময়।

অনন্ত ডাক্তার এক একজন রোগীর মাথায় হাত রেখে মিষ্টি হেসে ছত্রিশগড়ি ভাষায় জিজ্ঞাসা করছে - তোরা কা তকলিফ হ্যাঁয় ! তোমালা হামেশাই বোলাথান আভি ঋতু পরিবর্তন হোতে। তুমন থোড়াসি সাওবধানি সে রইহা। সাফসুতরো রইহা। তুমন হামার বাতলা নহি মানথস। শুন্ তুমান লাইকা মানলা ইস্কুল কাবার নাহি ভেজথাচ? (তোদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছিস তো?)

ওদের মধ্যে একজন বললে - অঙ্গনওয়াড়ি ঔর মিডল ইস্কুল হ্যাঁয় ইসিলিয়ে বাচ্চামন খাইবার পাথে ডাক্তারসাহাব। (অঙ্গনওয়াড়ি আর মিডডে ইস্কুল আছে বলেই তো ওরা দু'মুঠো ভাত খেতে পারছে ডাক্তারসাব।)

কথার মাঝেই রোগীকে স্টেথোস্কোপ দিয়ে অনুভব করে হৃদপিন্ডের স্পন্দন। প্রেসার মাপে। অভুক্তদের সুগার মাপে।

অবশেষে আর্য়ুবেদিক, অ্যালোপ্যাথি অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট, টনিক, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, কাউকে ইনজেকশন দিয়ে শুধু ন্যায্য দামটা নিয়ে বিদায় দেয় রোগীদের।

কয়েকজন রোগীর চিকিৎসা পদ্ধতি দেখে অনন্তকে জিজ্ঞাসা করলাম - তুমি তো ভিজিট নিলে না অনন্ত?

অনন্ত একটু ম্লান হেসে বললে - ওদের যে ভিজিট দেবার ক্ষমতা নেই দিদা। ঔষধ কোম্পানির 30% কমিশনেই আমাদের চলে যায়। তবে হ্যাঁ, অর্থবানদের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ভিজিট নিই। তাছাড়া ওদের কাছ থেকে অর্শ ভগন্দর ফিসচুলার জন্য আমাদের পূর্বজ নম:দের আবিষ্কৃত চাঁদসী পদ্ধতিতে অপারেশনে পাঁচ হাজার, প্রসব কেসে দু তিন হাজার টাকা নিই।
- আবার ক্ষেত্র বিশেষে বিনা পয়সাতেও চিকিৎসা অপারেশন করো, তাই তো?
- না করে উপায় কি দিদা ! এই কাচন্দা বাজারে প্রাইমারী আর্য়ুবেদিক হাসপাতাল আছে। কিন্তু ডাক্তার নেই। এখান থেকে আটমাইল দূরে জৈজৈপুর মহকুমার হাসপাতালে মাত্র ত্রিশটি বেড। সেখানেও ডাক্তারের সংখ্যা কম। এখান থেকে সকালে মাত্র তিনটি বাস মন্থরগতিতে বিলাসপুর, চম্পা, বারোদরা যায় বাদুড়-ঝোলা হয়ে। আবার বিকেলে ফিরে আসে হেলে দুলে। কুড়ি মাইলের মধ্যে আমিই একমাত্র ডাক্তার। তাই রাতবিরেতে দীন দরিদ্র রোগীরা চিকিৎসার জন্য আমার কাছেই ছুটে আসে।
- সিরিয়াস বা মেজর অপারেশন কেস এলে কি করো?
- এখানে তো আর অ্যাম্বুলেন্স নেই তাই আমার গাড়িতেই সদর হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আসি। আপনি ভেতরে যান দিদা। অবসর সময় অনেক গল্প করবো।

মধ্যঘরের সোফায় আরাম করে বসে দাসবাবু তখন নাতবৌয়ের সাথে খাসগপ্পে মত্ত। একটু পরেই খাঁটি গরুর দুধে তৈরী চিনি ছাড়া দু'কাপ চা নিয়ে এলো রিম্পি। আমি খাটের ওপর আয়েশ করে বসে চা'য়ে এক চুমুক দিয়ে বললাম- একি তোমার বাবা মাকে চা দিলে না?

রিম্মি বললে - আমার বাবা কোন নেশাতেই আসক্ত নন। মা ও আমি শুধু সকাল সন্ধ্যায় দু'কাপ চা পান করি।
- বা: আচ্ছা সোমা, ডায়রিয়া, শ্বাসকষ্টের জন্য তোমরা স্যালাইন, অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করো না কেন?
- করি তো। ঐ পাশে দুটো ঘর আছে। একটি প্রসূতি মায়েদের জন্য। অন্যটি স্যালাইন, অক্সিজেনের জন্য।

দাস বাবু এতক্ষণ আমাদের কথাগুলি গিলছিলেন। এবার বললেন - আচ্ছা তোমাদের গেটের পাশে যে ছোট্ট সুন্দর শিবমন্দিরটা দেখলাম, ওটা কি তোমরা স্বপ্নে পেয়েছো?
- না না আসলে এখানকার লোকেরা বেশিরভাগ শৈব মানে শিবের ভক্ত। তাই প্রতি বছর শিবরাত্রিতে আপনার নাতি নিজেই পুজোপাঠ করে পাচঁ সাতশো লোককে নিরামিষ আহার করান।
- সেই কারণেই কী রোগীরা নমস্তে মহারাজ বলে অনন্তকে সম্বোধন করলো ?
- আপনার নাতি পাগলচাঁদের মতে দীক্ষিত হয়ে পৈতা ধারণ করেছেন। তাই এখানকার লোকেরা ভাবে আমরা ব্রাহ্মণ। তাছাড়া উচ্চবর্ণের রোগীরা বাধ্য না হলে নিম্নবর্ণের ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাতে যায় না।
এখানে ব্রাহ্মণদের মহারাজ বলেই সম্বোধন করে সবাই।
- এখানকার সব্বাই মাকে কি বলে ডাকে জানো দিদা?
- তুমি না বললে আমি জানবো কি করে!
রিম্পি হেসে বললে - মহারাজী ডাক্তার ম্যাডাম।
- তোমার মা'ও চিকিৎসা করেন না কি?
- মা'তো মহকুমা হাসপাতালের ANM তাই বাইকে চেপে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঘন্টা চারেক ডিউটি করেন। বাকি সময় রান্না করেন। ঘর সংসার গোছানোর মাঝে ফিমেল পেশেন্ট দ্যাখেন। ঔষধের দোকান সামলান।
- শুনেছি তুমি কলেজে পড়ার সাথে সাথে মেডিকেল কলেজে ভর্তির প্রস্তুতিও নিচ্ছো। তা তুমি কি ডাক্তার হয়ে গ্রামে প্র্যাকটিস করবে না কি শহরে?
রিম্পি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে - গ্রামে থাকারই তো ইচ্ছে কিন্তু - ! জানেন এখনকার গ্রামগুলিকে বস্তি বলে। বস্তির দরিদ্র মানুষেরা বড্ড সহজ সরল ভালো। তাই আমার বাবা মাকে খুব শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। এদের পাশে তো কোন ডিগ্রী ধারী ডাক্তার নেই। তাই জন্য আমার বাবা পশ্চিমবংগের জনা দশেক বেকার শিক্ষিত ছেলেদের এখানে এনে,আমাদের বাড়িতে রেখে খাইয়ে পড়িয়ে হাতেকলমে ডাক্তারী শিখিয়ে বিভিন্ন বস্তিতে চিকিৎসক হিসাবে বসিয়েছেন। তাতে প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু তো গরীবরা পাচ্ছেন!
- সত্যি কথা বলছি দিদু, তোমাদের বাড়িতে আসার আগে "কোয়াক ডাক্তারদের" সম্পর্কে আমার একটু অশ্রদ্ধার মনোভাব ছিল। আজ আর তা নেই। যদিও আমি জানতাম বহু দলিতবর্গের নম: পরিবারের বাঙালি শিক্ষিত বেকার ছেলেরা (অ্যালোপ্যাথি ট্যাবলেট, টনিক,ইনজেকশন সহ) আয়ুর্বেদিক, চাঁদশি মতে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গ্রামবাসীদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন এবং করছেন।

সোমা তাড়া লাগায় - দাদু, দিদা বাথরুমে তেল সাবান গামছা গরমজল রেখে এসেছি। স্নান করে মাছ ভাত খেয়ে একটা ঘুম লাগাও। তারপর পাশের বড়বস্তি নদীর পাড়ের জাগ্রত শিবমন্দিরটা দেখিয়ে আনবো। ওঠো।

রোগী দেখার ফাঁকে একবার অনন্ত এসে আমাদের খাবারের তদবির করে গেল। ক্ষমাও চাইল একসঙ্গে খেতে বসতে না পারার জন্য। রিম্পিও বললো ও টিয়াপাখির সাথে একপাতে না খেলে পাখিটা খেতে চায় না।

রাতের ট্রেনে আমাদের ঘুম আসে না। ঘন্টা দুই ঘুমোনোর পরে জানলাম, সোমা এখনো ডিউটি থেকে ফেরেনি। ওর মিটিং আছে। তাই ফিরতে দেরি হবে।
অনন্ত সবে খেতে বসেছে। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম - তুমি কি প্রতিদিন এই অবেলায় ভাত খাও?
- না। আসলে আমার খাবারের নির্দিষ্ট কোন সময় থাকে না। রোগীরা হয়তো খালিপেটে কত দূর থেকে পায়ে হেঁটে আসে আমার কাছে, আর সেই আমি কি ওদের বসিয়ে রেখে খাবার খেতে পারি?
- তুমি ধীরে সুস্থে খাও। আমরা একাই একটু তোমাদের বাজার, বস্তিটা ঘুরে আসি।
- আমাদের এই কাচন্দা বস্তিতে চার হাজার ভোটারদের বাস। অধিকাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে। মাটির দেওয়ালের বাড়ি ঘর তথৈবচ। ওদের মধ্যে দু' তিনশো একর চাষজমির উচ্চবর্ণের মালিকরাও আছেন। তাদের বেশভূষা চেহারা দেখে আন্দাজ করতে পারবে না। বাড়ি ঘর দেখেও না। ওদের শহরে পাকাবাড়ি গাড়ি আছে। সবাই ব্যবসা করেন। ফেরার পথে নদীর পাড়ের মন্দিরটাও দেখে আসবেন দাদু।

নাস্তিক দাসবাবু তাচ্ছিল্য ভাবে বললেন - না ভাই ঐ সব মন্দির মসজিদ গীর্জার প্রতি আমাদের কোন শ্রদ্ধা নেই। যতটা শ্রদ্ধা আছে মানুষের প্রতি।

পরের দিন সকাল পাঁচটায় ঘুম ভেঙ্গে গেল দুজনের চিৎকারে -''ডাক্তার সাব, ডাক্তার সাব''।

অনন্ত সোমার জীবনে দিন রাতের ঘুম, বিশ্রাম নির্ভর করে রোগীর আগমন প্রত্যাগমনের উপর। অসুখ বিসুখতো আর ডাক্তারের বিশ্রামের, ঘুমের হিসাব করে আসে না। তাছাড়া এখানকার দরিদ্র দলিত, অদলিত মানুষের জীবনে রোগগুলো যেন রাতেই আসে বেশি। রোগীরাও গত ত্রিশবছরে জেনে গেছে বাঙালি মহারাজ ডাক্তারের কাছে দিন রাত সবই সমান।

অনন্তের সাথে আমরা দুজনে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সকালের ম্লান আলোতে রাতের অন্ধকার তখন মুছে গেছে। গতকাল দুপুরে ৩৯ ডিগ্রী তাপমাত্রা থাকলেও আজকের সকালের হিমেল হাওয়া বুঝিয়ে দিল কিছুদিন আগে প্রবল শীতের দাপটে দরিদ্র মানুষের কাঁপুনি থামতো না।মহুয়া পলাশ শিরিষ গাছের ডালে বসে পাখিদের ভৈরবী সুরের কলতান ভেসে আসছে কর্ণকুহরে। রাতজাগা তিনটি নেড়িকুত্তা কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে অনন্ত ডাক্তারের গেটের পাশে। যেহেতু অনন্ত সোমা রিম্পির হাতের দেয়া খাবার খেয়েই বেঁচে আছে ওরা। ওরাতো আর কিছু সংখ্যক মানুষ নয় যে অকৃতজ্ঞ হবে!
অন্যদিকে একটি খোদাই ষাঁড় আরামে শুয়ে জাবর কাটছে।
অনন্ত বললে - হে লাইকা, কবর চিল্লাত রহেস। কা হোইস, কোন্ বিমার হওয়ে? (কি হয়েছে, কার অসুখ? চেম্বারে আয়।)
আগত তিনজনের একজন বললে - কোই বিমারি না হোই মহারাজ।
- তবে এমন চিৎকার করে ডাকছিলি কেন?
- মোর জিগরীদোস্ত যোগিন্দর যাদব, ঠাকুর সাহেব'কে তড়িয়াপাড় মহুয়া পেড়মে ফাঁসিয়া গেহে। (পুকুর পাড়ে, মহুয়া গাছের ডালে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে।)
- যোগিন্দর যাদব ! মতলব যো লেড়কা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়কে বেকার বৈঠে হেয়?
- হে ডাক্তারসাব। কুছ দেড় পহলে মংলু ঝাড়পে লেট্রিন করনেকে লিয়ে যাকর দেখিস। (কিছুক্ষণ আগে মংলু পুকুরপাড়ে পায়খানা করতে গিয়ে দেখেছে।)
- তো আমি গিয়ে কি করবো ! এসব কেসে আমি তো আর ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। এসব পুলিশ কেস।

আর একজন মিনতি করে বললে - আপনি গিয়ে শুধু কানে যন্ত্র লাগিয়ে দেখবেন, যোগিন্দর বেঁচে আছে কি না।

বেঁচে থাকলে আমরা বডিটা গাছ থেকে নামাবো। তুরন্ত চলিয়ে ডাক্তার সাব।
অনন্ত সার্ট প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে জানতে চাইল - যোগিন্দর হঠাৎ আত্মহত্যা করতে গেল কেন!
তোরা তো ওর বন্ধু বান্ধব। জানিস কিছু?

উত্তর বস্তির কলেজে পড়া আদিবাসী মেয়ে ছিমলীর সাথে গোতিয়াপাড়ার যোগিন্দর যাদবের প্রেম ছিল বহুদিনের। গতরাতে যোগিন্দর তার বাবা মা কাকাদের জানায় সে ছিমলীকে বিয়ে করতে চায়। এই জাতমারা কথা শোনার পরে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যোগিন্দরকে লাঠিপেটা করে ওর বাবা এবং তিনি দলবল নিয়ে ছিমলীদের বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে, মারধোর করে, পাড়া ছাড়া করে ছিমলীর বাবা মা ভাইকে। ভাগ্যিস তখন ছিমলী রায়গড়ে মাসির বাড়িতে ছিল। নইলে তাকেও পুড়িয়ে মারতো ধনকুবের যাদবরা।

এ কথা শুনে মহুয়ার ঠেক থেকে যোগিন্দরকে তুলে নিয়ে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি রাতে। তারপরে কখন যে গলায় ফাঁস লাগিয়েছে তা আমরা জানি না। আপনি আমার মোটরসাইকেলে বসুন।

ভট্ ভট্ শব্দে বাইকটা অনন্ত ডাক্তারকে নিয়ে মিলিয়ে গেল বস্তির কাঁচা পথে। নেড়িকুকুর তিনটি মাথা উচু করে একবার দেখেই পূর্ব অবস্থার মত কুন্ডলী পাকিয়ে নির্লিপ্ত ভাবে শুয়ে থাকে। ওরা যেন জানে শুধু ছত্রিশগড়ের মাটিতে নয়, এমন করে ভারতের সব প্রদেশেই দলিতদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে পাড়া ছাড়া করা হয়। দলিত নারীদের ধর্ষন করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কখনওবা ফাঁস লাগাতে বাধ্য করা হয় ছেলে মেয়েদের।
যদিও, এ ক্ষেত্রে না হয় দাম্ভিক বর্ণবাদী যাদবরা একঘরে হবার ভয়ে এবং কঠোর সমাজের অনুশাসনকে বজায় রাখতে নিজের ছেলেকেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছে। যাতে ভবিষ্যতে আর কোন ছেলে মেয়েরা জাতের গন্ডী ভাঙার চেষ্টা না করে।
মনে পড়ে যায় পুরনো একটি কথা - মানুষের মন থেকে জাতপাতের উঁচু নীচু ভেদাভেদ যতদিন না মুছে যাবে, ততদিন মানুষের মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটবে না।

Royal Residency

Contact: Ashok Roy (91-98303 37384)

Starting at Rs 3990/- sq. ft.

Near Chinar Park, Dashadrone, Rajarhat (1.15 km from Chinar Park, 3.75 km from Airport)

(AC Community Hall, AC Gymnasium, AC Temple (Rooftop), Rooftop Garden, Vastu Approved, Beautiful Entrance & Corridor, Water Filtration Plant, 24 hr Generator Back-up, 24 hrs Security, Intercom & CCTV)

Our Project Partner: STATE BANK OF INDIA, ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED

Approved by: RAJARHAT RAPC   Developed by: Royal Construction

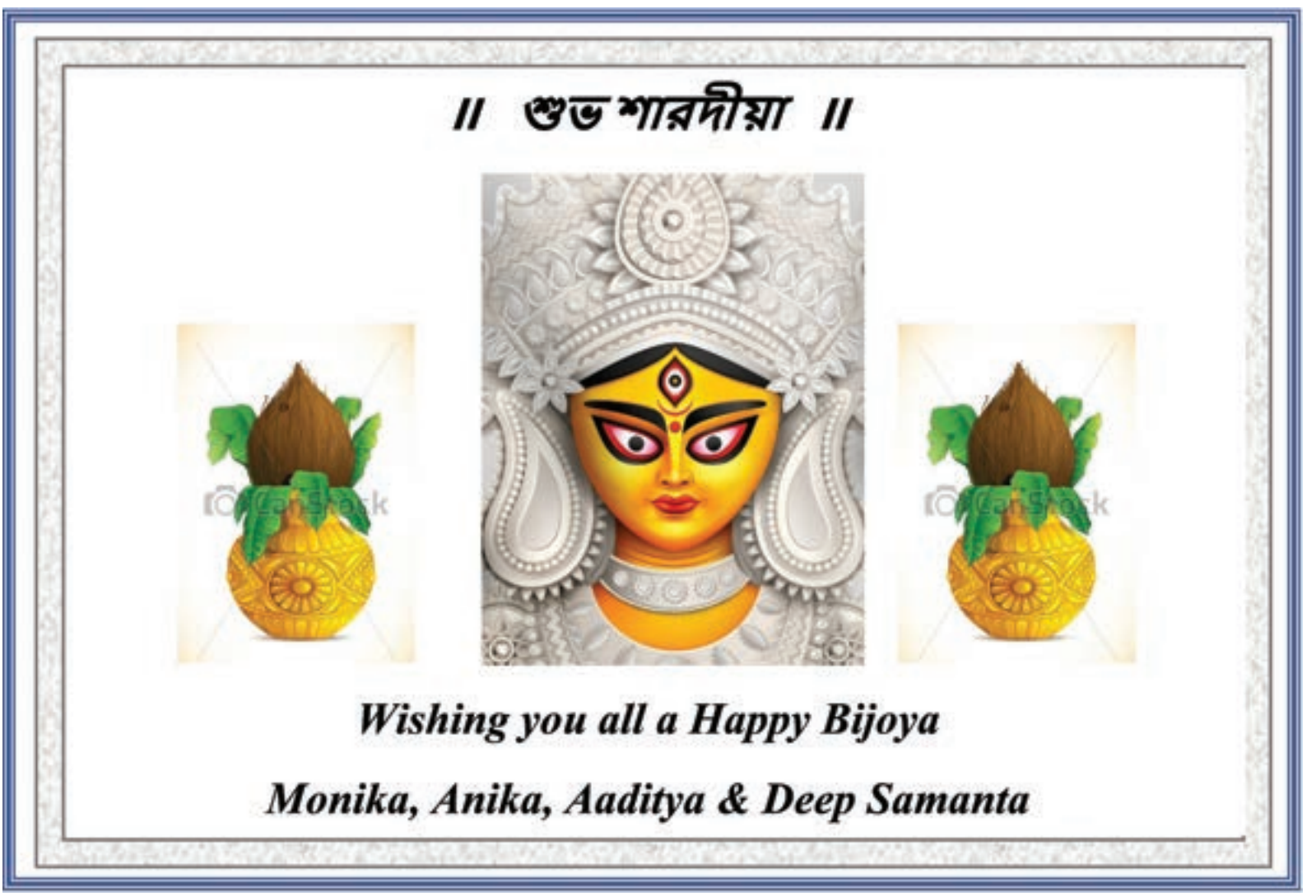

॥ শুভ শারদীয়া ॥

Puja Greetings

Dipti Prokash Roy, Indrani, Debjani, Deborshi, Isha, Rishaan & Roshni

অন্য অজুহাতে

ড. আতিউর রহমান

বাড়ালে হাত দূরত্ব আপনি বোঝা যায়
ঝাপসা হলেও মন থাকে দৃষ্টিতে,
বর্ষা ভেজায় অঘুম রাতের তারা
নামের ফলক পড়া কি যায়, যে পথ আড়াল রাখে...।।

ভালবাসার আকাশ মিথ্যে শুধুই
এক জীবনে হল না শোধ দেনা...
বোঝে মন দু' মেরু'তে জন্মের আড়াআড়ি
চলছে একা সময়, ঘরে ফেরে না।

থামল না স্টেশনে দূর পাল্লার ট্রেন
আজও একা ভিজে মন অপেক্ষায়,
শেষ দেখা এখন ফাঁকা স্মৃতির লেন
আসা যাওয়া দূরের সে চেনা অচেনায়।

বাড়ালে হাত দূরত্ব আপনি বোঝা যায়
ঝাপসা হলেও মন থাকে দৃষ্টিতে,
বর্ষা ভেজায় অঘুম রাতের তারা
নামের ফলক পড়া কি যায়, যে পথ আড়াল রাখে...।।

উজ্জীবন

ব্রতী ভট্টাচার্য

অস্তিত্ব কে শেষ বার শিকড় থেকে ছিন্ন করবার আগে,
হে ব্যাপ্ত উদার
তোমার দ্বিধাহীন স্বচ্ছতায় আমায় স্পষ্ট হতে দাও!
স্নাত হতে দাও আমায় তোমার অতল স্পর্শ পবিত্রতায়,
বাঙময় করো তোমার সবাক মৌনতায়|
আবৃত্ত ঘূর্ণিতে, ক্লেশে ক্লেদে পরিকীর্ণ চেতন আমার পরিশুদ্ধ করো।
তোমার স্বত-উৎসারিত তেজ
আমায় মুক্ত করুক অশেষে অনন্তে
নিরন্তর হোক উজ্জীবন!

On His Deep Memories

Jahar Haque

It was towards the very end of
Two thousand and nineteen
When his health and hope
Both began to fast decline.
And one morning
He expected me
To meet with him.
And sad that it did not happen
For not a fair reason.
And was more heartbreaking
That one early morning
He became no more to meet with.
To mitigate that murmur
That very night my heart cried
And cried hard
And did become
Soft and calm.
Then a known voice whispered,
"Bhaalo aachhi bhaalo theko.
Aakasher thikanay chithi likho."

The next morning I wrote to him
At the sky dot com:
My dear brother,
For many a year
I had gathered
A variety of your memories.
Some of those are truly
So charming and so pleasant
And some are not such pleasant
But touching much more.
And those that sound a bit funny
Are not crazy for sure.
And some of your memories are
So solemn and so deep and so loving.
And the most recent ones are
Much somber and very saddening.

Let me recall a few-
In the 22nd morning of last November
I texted to you,
"Shubho sakal; shubho janmodin.
Bhalobasa o' shubhechha neben;
Bhalo thakben".
And within a minute you replied,
"Dhonyobaad, tomra-o bhalo theko."

On another day when
You had not been
Feeling so well,
In response to my voice mail
You wrote,
"I am humbled; pray for me."
And I did pray for you.
I prayed with my four favorite words:
'Peace Be Upon You'.
And then I did repeat it
Several times
And many times.
Thereafter
My heart recited,
"Raabbana aatina fid duniya
Hasanaten woa fil akheraati
Hasanaten woa qina azabannar"
While exceedingly thinking of you
With my deepest love
And respect profound.

A few days later did reveal
That 'Time', the most powerful,
The one that came creeping
In a fast and fierce pace
To claim you form you and from us,
Reminding me
The 'Supreme Being' saying,
"Kaalo'smi loko-kshaya-krito probriddho
Lokan samahortum iho probrittoh."
It was truly so painful
To see you leaving fast forwarding
Everything yours remaining.

Back to my memoir,
During the celebration
Of our last Durga puja,

While cooking in the church kitchen
I came to know-
On the Facebook
You posted a picture with a caption
I paraphrase-
"This is Jahar, a good friend;
And sad that these days
He forgets to see me."
From the kitchen I rushed and said:
I am so sorry
And I hugged you.
That time
What could foretell me
That was our last meeting
And that was destined to be
Or a random chance
Indifferent!

Silently

Sanchita Mal Sarkar

Silently …
night falls on the Hudson River
birds come back to their nests
boats return to shore
tranquil breezes pass, murmuring through
verdant foliage
water trickles over smooth rocks
little crickets chirp
incessantly
your gentle touch and love
my heart fills with joy …

today's last sun-rays kiss the Hudson River
Greens and purples melt
into grey
no trace of stores and street lights
the faintly visible horizon disappears
in darkness
a simple sweetness of existing, of being, of breathing
in dark…

the September Night gets darker
starless and moonless sky
no twilight, only blackness
I can no longer see you in the dark
waiting for fireflies' flickering light
a loving silence hangs in the air
perhaps, silently watching me
grow accustomed to the dark

Lockdown পাঁচালী

দেবপ্রিয়া গোস্বামী

২৬ শে এপ্রিল, ২০২০ COVID-19, Ohio Lockdown পরিস্থিতিতে 'Bengali Cultural Society of Cleveland' দ্বারা Webex এর মাধ্যমে সংগঠিত "আজ একটু গল্প হোক" এ সদস্য দের থেকে সংগৃহীত গল্পের সারাংশ হিসাবে রচিত "Lockdown বিবৃতি"

ওহায়ো রাজ্য তথা ক্লীভল্যান্ড শহরে
আজি শীতের শেষে নতুন বসন্তের ডাক,
বৈশাখে হয় যেথা কখনও তুষারপাত
সেকথা পরে হবে এখন তোলা থাক।।

এমনইখানে আমাদের মতো কিছু
মাছে ভাতে সাধারণ বাঙালির বাস,
বারো মাসে তেরো পার্বন নিয়মিত হয়
ছন্দে গীতে আনন্দে ভরে একরাশ।।

সবই তো চলছিল ভালো, কিন্তু হঠাৎ
ছোঁয়াচে রোগ করোনা'র আগমন,
Invisible enemy রুখতে
ব্যস্ত আমাদের সকলের জীবন।।

রুদ্ধ হয়েছে সবখানের দ্বার
প্রত্যেকে হয়েছি যে যার গৃহেবন্দি,
Handmade mask বানিয়ে
এঁটেছি তাই মুক্তির ফন্দি।।

নেই কোনো বিশল্যকরণী সন্ধান
নেই জব্দ করারও কোনো অভিধান,
শুনছি social distancing নাকি
এই মুহূর্তের একমাত্র সমাধান।।

অযথা গুজব রটাবেন না
আতঙ্কিত হবেন না দেখে গণনা,
শুচিবাই কমবেশি হয়েছি সবাই
হাতে eczema নিয়েই তাড়াবো করোনা।।

বাজারে যাই, কেবল খাই আর শুই
মাঝে মাঝে অবশ্যই করি job 9 to five,
মরলে মরবো ভেবে কি হবে তাই
স্বর্গ থেকেই করবো তখন Facebook live।।

রীতিনীতি যাই হোক হালকা হবো কথা বলে
সাক্ষাতে হোক কিংবা Virtual,
দেশে থাকি অথবা বিদেশে
বাঙালির কি আর আড্ডা ছাড়া চলে।।

Webex এর সাহায্যে করা হয়
এক সান্ধ্যসভার আয়োজন,
অত:পর পানীয় হাতে শুরু হয়
একে একে বঙ্গের সাতকাহন।।

জলের দামে পেট্রল হলেও
একদম চলছে না কারোরই গাড়ি,
Netflix, Prime, Hotstarএ নেশামগ্ন
এ যেন কাজে ভরা bigbossএর বাড়ি ।।

কি খাই কি খাই রোগ বেড়েছে
Pantry পাহাড়াই এখন main task,
তাই ঘরের মধ্যেও বাধ্যতামূলক
হতে পারে বাইরের মতো mask।।

ডালগোনা চালগোনা'র পর
চা গোনাতেও কেউ হচ্ছেনা bore,
দাম্পত্য প্রেম উঠেছে উথলে
শুধু বাচ্চারা জালাচ্ছে দিনভর।।

অনেকে করেছেন canvasএ আর্কিবুকি
বানিয়েছেন কাগজের গয়না, crochet চটি,
অনেকে জ্যামিতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।।

বন্ধের বাজারে শুরু হল সব্জির চাষ
যাতে সব পাই একেবারে তাজা,
জানিয়ে রাখি ফোনে booking চলছে
যদি কারো খেতে ইচ্ছে হয় গজা।।

গানে ভুবন ভরিয়ে দিলেও
সাথে চলবে রাশি রাশি গল্প,
নিজ রেসিপি বা YouTube এর কৃপায়
এখন তো রন্ধনই শুধু শিল্প।।

চাল ডালের করেছি মাস তিনেকের stock
কিছুতেই দেবোনা তাতে হাত,
আর কিছু না জুটলে যে
খেতে হবে তো সেই ভাতে ভাত।।

অফিসে বসে meetingএর পর
Schoolএ online পড়ার সময় ধার্য,
ডাক্তার,নার্স, শিক্ষক জরুরী সেবায়
সকলের অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য।।

ব্যস্ততার মাঝে সত্যিই ভুলেছিলাম
কোনটা secondary কোনটা prime,
Chinese Checker আর board game
এখন আমার favorite family time।।

Facebook, Twitter, Instagram
WhatsApp forward তো latest hobby,
সময় না কাটলে পরে করে নিই
News channel আর Googleএর study।।

আবিষ্কারের পথ চেয়ে আছে আনন্দ
2020 দেখি জীবনের সব চেয়ে বড় স্মৃতি,
ভালো আছি, ভালো থেকো বলেই তবে
শেষ করি আজকের lockdown বিবৃতি।।

The Hardships of a Table

Sourya Bhattacharya (10 Years)

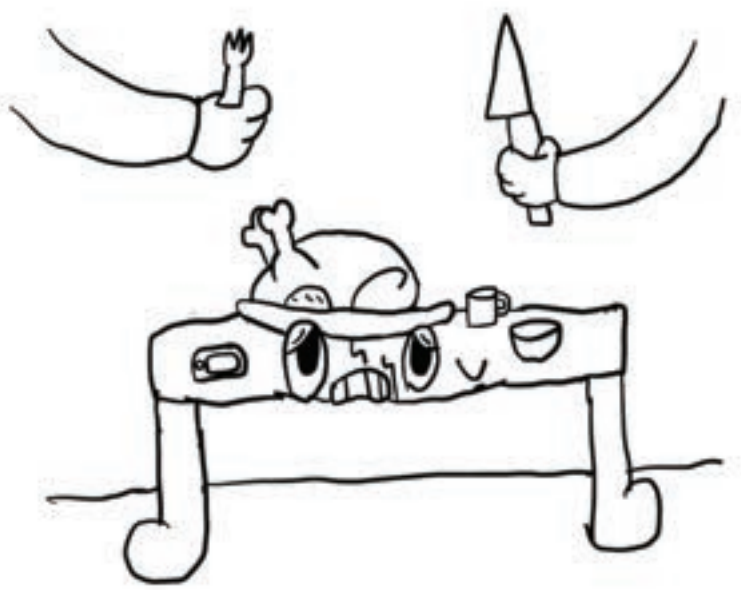

When you eat or you put things
On a table, do you ever stop to wonder,
How this piece of furniture
Usually never does a blunder.

Try to imagine, how much it prays,
That what it's carrying will go elsewhere
And yet it's working hard,
It's implements and utensils it will bear!

Let's say you decide to make,
A big, mouthwatering turkey
And the table knows
For relaxing, his future's quite murky.

So, when you put things on your table
Like bowls and other objects,
Just remember to remember
To your table pay respects.

Illustrated by Sourya Bhattacharya

Very Berry

Anahita Chowdhury (8 Years)

Berry, berry,
What a berry delight!
Soo sweet,
Or so sour.
So small,
Or soo big.
Soo tasteful!
Or so plain.
Berry,
Very berry,
A world of berries,
Like berry juice,
Or berry you,
Hahaha,
BERRIES!!!

Illustrated by Anahita Chowdhury

Seasons Greetings to the Community

Jayanta,
Jean & Jagannath Das

শারদীয়া অভিনন্দন

গণেশ সেন, ইন্দিরা সেন

Snehakshi Mondal (6 Years)

Ayona Sen (7 Years)

Rohan Ghosh (9 Years)

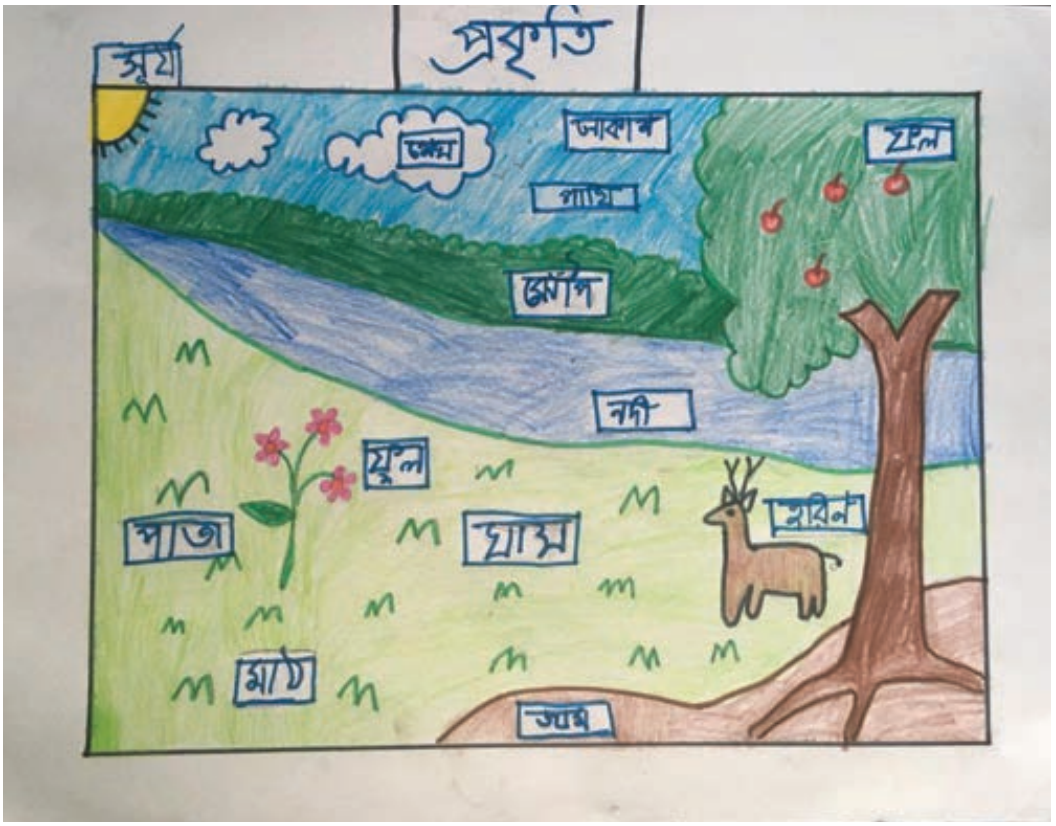

Riyana Sengupta (8 Years)

Nehali Dey (9 Years)

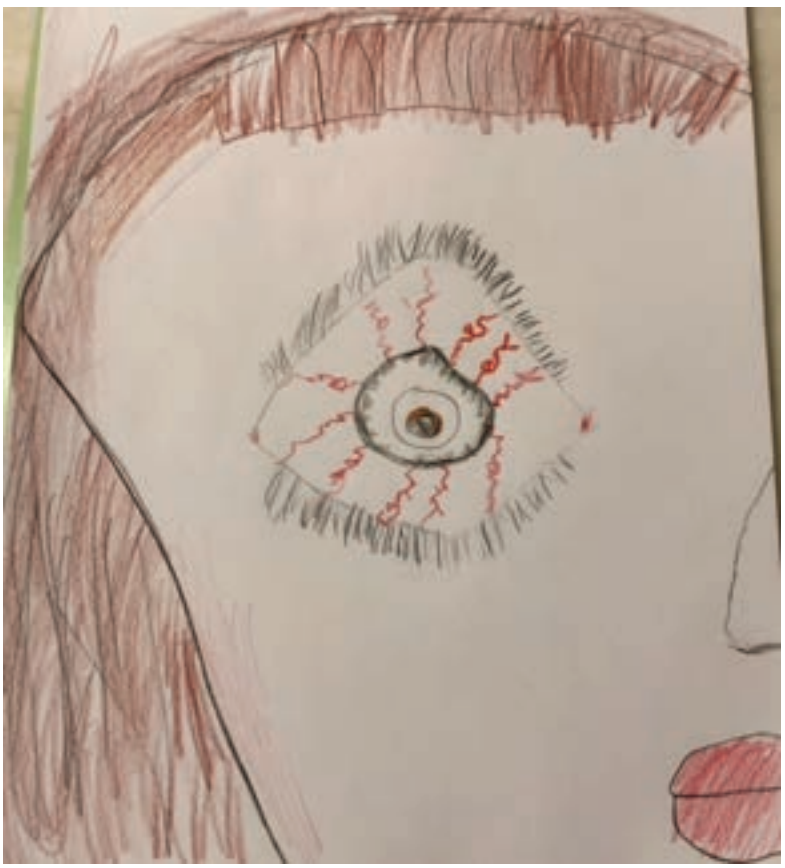

Anushka Goswami (9 Years)

Aaryav Mukherjee (8 Years)

Sunset over the City with reflection on the Lake

Prachaya Upreti (9 Years)

Rishabh Deb (9 Years)

Blue Sky

Aaditri Ghosh (9 Years)

Sonakshi Mondal (11 Years)

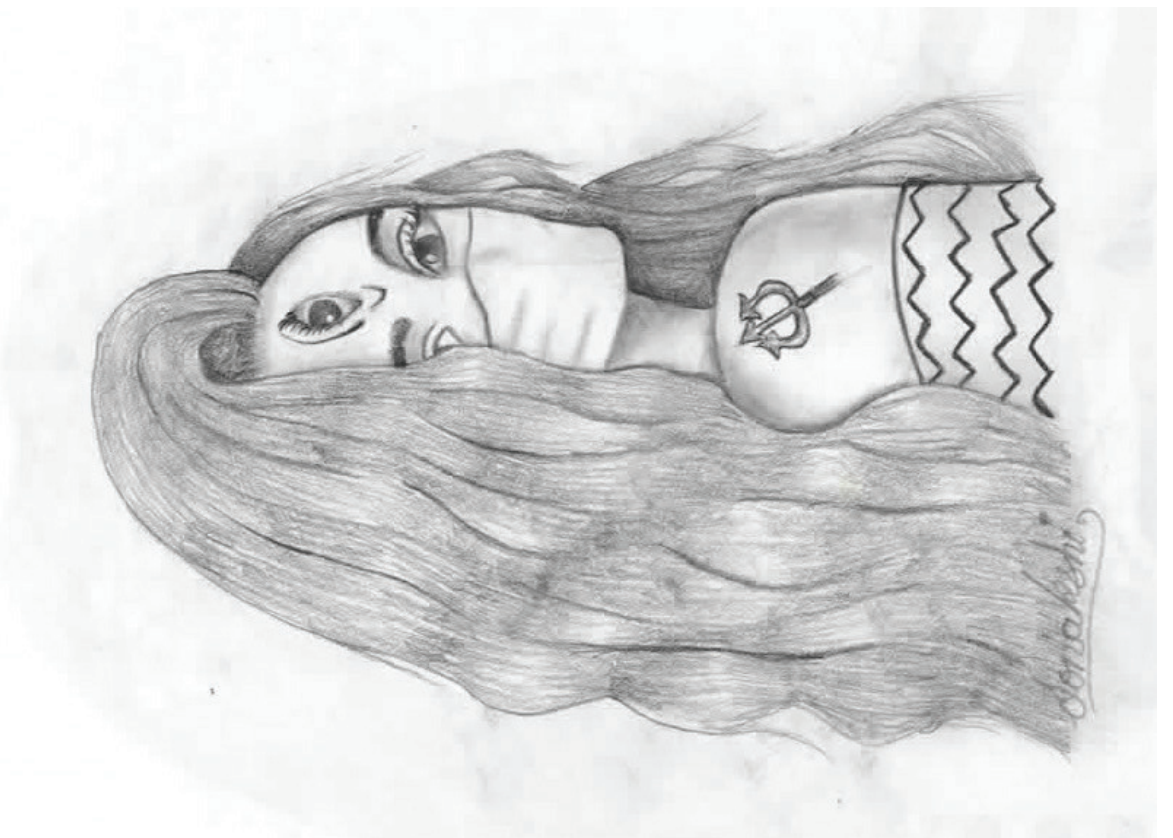

Aryan Ghosh (12 Years)

Aanavi Biswas (11 Years)

Life is Colorful

Sumeet Chakravari (13 Years)

Riddhima Deb (13 Years)

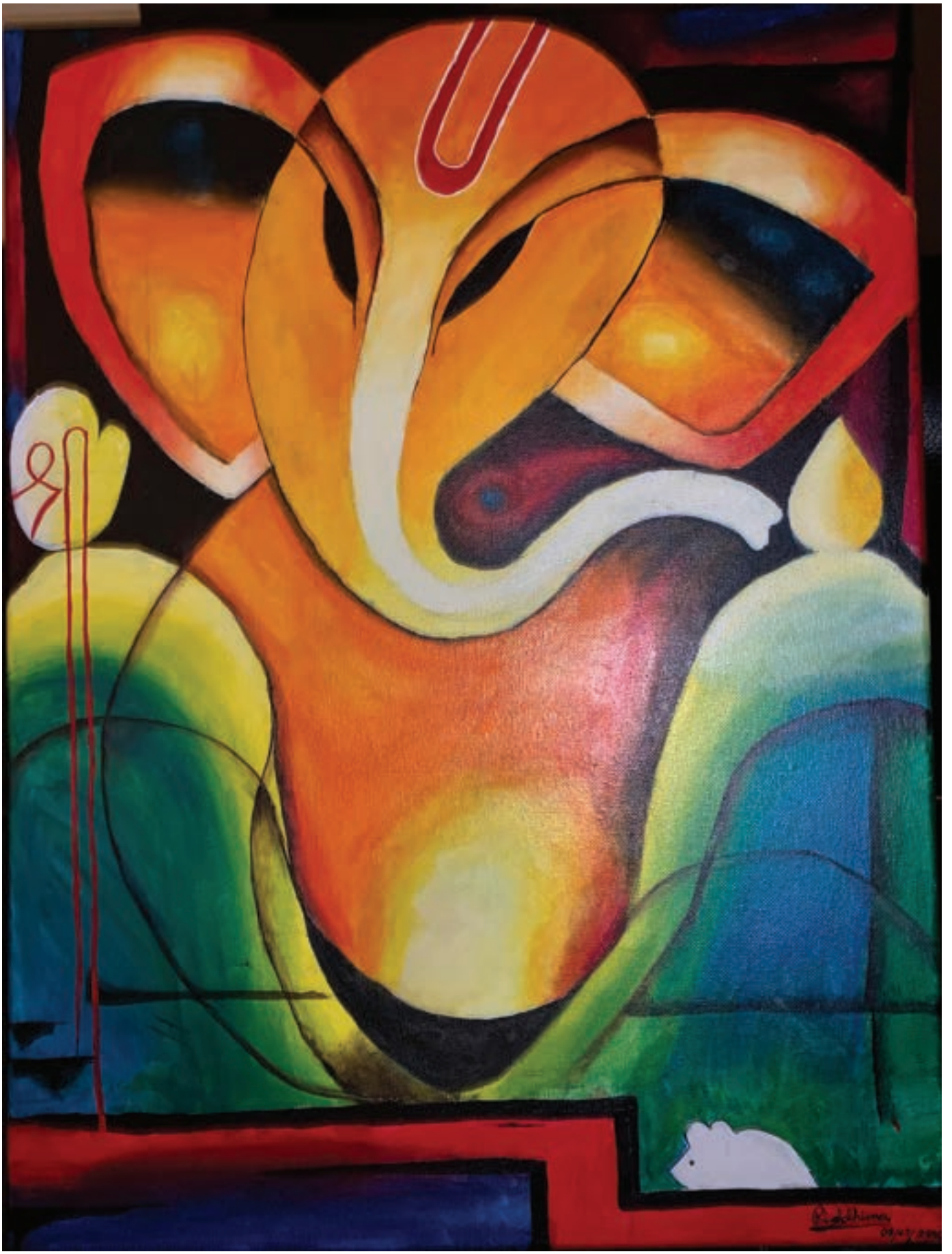

Abstract ganesha

Aankhee Talukdar (15 Years)

Chumki Deb

Royal Elephant

Puja Ghosh

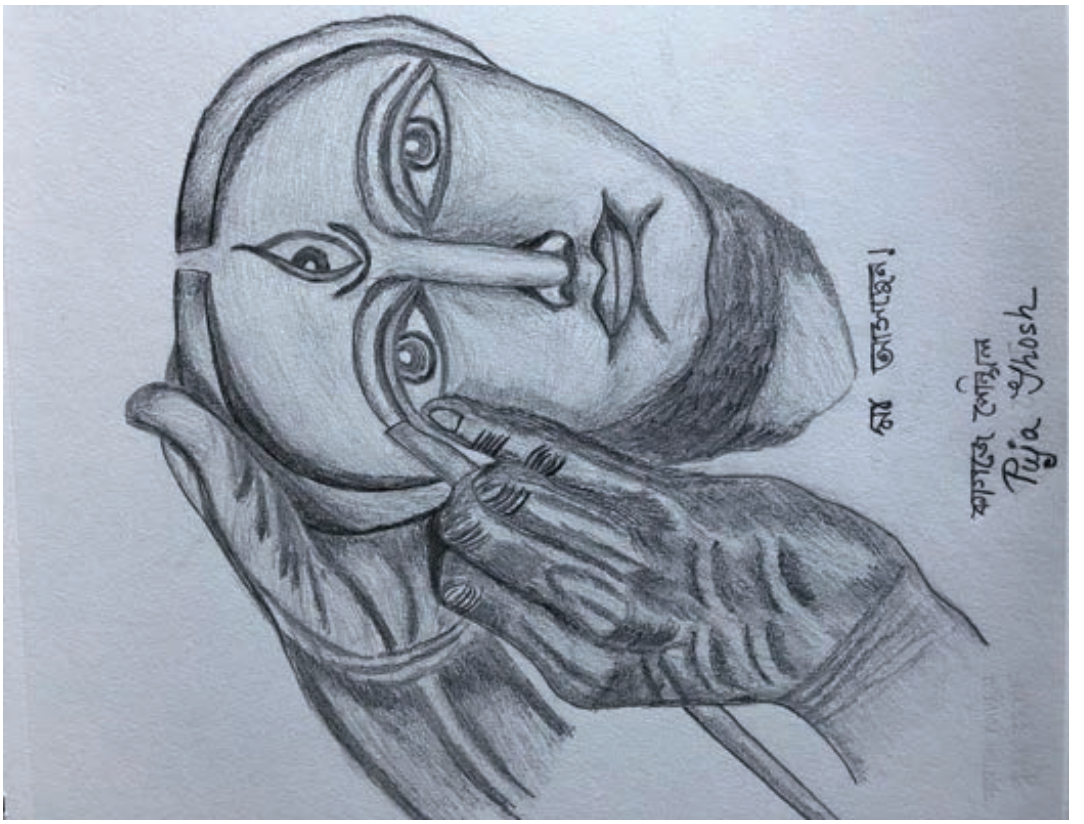

Ma Aschhen

Seema Das

Debolina Maity

Sharbani Ghosh

Mountains of Oregon

অমিতাভ চৌধুরী

শারদ সম্ভাষণ

উৎপল, শ্যামন্তী ও উষসী দত্ত

Puja Greetings

Suman, Soma & Sumeet
Chakravarti

শুভজিৎ ব্যানার্জী

গণেশের বাহন

বাবা রেসপনসিবি লিটি কাকে বলে
ওরে বাবা ... যেটা আমার নেই

যেমন এখন লাইট বন্ধ করা টা আমার রেস্পন্সিবিলিটি , যাতে তুমি ঘুমিয়ে পর

এলেক্সা লাইট বন্ধ কর,
শুভ রাত্রি,

পরদিন সকালে..স্কুল যাওয়ার সময়

আর তারপর থেকে গণেশের বাহন হল ইঁদুর.....	----- শুভ

“বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি”
সকলকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই

Nitis, Chandana, Richik, Andrea,
Prateek Sarkar, Adrienne Day,
Diyamoni Sarkar and Harry

শারদ শুভকামনায়

রতন, বাসবী,
তিয়া ও তানী মৈত্র এবং খুশি!

মাতৃমন্দির পুন্যঅঙ্গন কর মহোজ্জ্বল...

Seasons Greetings to all our friends in the community

Rakesh, Ravi, Rimi, David, Arjun, Anita, Lily, Aria, Sipra & Amiya Banerjee

আমাদের ঘরে দুর্গা নেই; আমাদের মা আছেন।
মা মানে অনেক আলো!

আপনাদের সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা:
তিতাস. শায়লা. জুনায়েদ. জুবায়ের এবং কুমু মমতাজ

Happy Durga Puja & Compliments for festive season

from Swapna, Bikram, Taniya, Anwesha, Sasha, Sanjoy, Melina, Camille & Samantha

এই মহামারীর সময়ে সবাই ভাল এবং সুস্থ থাকার জন্য রইল অনেক শুভকামনাঃ

“মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা
অগ্নি স্নানে শুচি হোক ধরা”

সুদিনের অপেক্ষায়-
ফাহমি, তন্ময়, ফাহিমা, আতিয়ুর

বিজয়ার প্রীতি
ও
শুভেচ্ছা জানাই।

Amit, Tanya, Rishav & Rhine

2020

শারদীয়া শুভেচ্ছা

- পার্থ, রানী, অনিকেত ও অয়না

সবাইকে শারদীয় অভিনন্দন

সৌমিত্র, মুক্তা, সোহন ও শালীন